বিমাতা।

(সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীযোগেন্দ্রনীথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা।

৩৯ নং পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা নিউ ক্যানিং প্রেস হইতে

শ্রীকিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

ও

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩০০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উপহার।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় মান্যবরেষু।

প্রিয় গুরুদাস বাবু,

আমি আপনার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, সে ঋণ এ জীবনে কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আপনি আমার চিরসহায়, আজ সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমার "বিমাতাকে" আপনার করে অর্পণ করিলাম। ইতি—

১লা আশ্বিন
সন ১৩০০ সাল।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
যোগেন্দ্র।

পড়া শিখিয়াছেন, আর বিশেষতঃ তিনি তারাসুন্দরীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি জননীর প্রস্তাবে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। এই বিষয় লইয়া অনেক সময় মাতাপুত্রে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইত।

পশুপতি নাথের বাড়ী কোন্নগর। কলিকাতার অতি নিকট বলিয়া তিনি বাড়ী হইতেই আফিস যাতায়াত করিতেন। এক-দিন রবিবার বৈকালে তিনি বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার জননী কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়াই আরম্ভ করিলেন—"আহা! ও পাড়ার বাঁড়ুর্য্যেদের ছোট বউয়ের কেমন ছেলে হয়েছে, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়োয়। আর আমার যেমন অদেষ্ট! বউটা বুড়ো মাগী হলো, তবুও নাতীর মুখ দেখ্‌তে পেলুম না গা? এমন লক্ষীছাড়া হতছাড়ীর সঙ্গে ব্যাটার বিয়ে দিয়ে ছিলুম যে, আমার কোন সাধ আহ্লাদই মিট্‌লো না গা? বউটা মরেও না যে, আবার ব্যাটার বিয়ে দিয়ে মনের সাধ মেটাই। ওলো তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌লো—গলায় দড়ি দিয়ে মর্, না হয় বিষ খেয়ে মর্।"

বিচিত্র মুখভঙ্গিমার সহিত পশুপতিজননী পুত্রবধূকে এইরূপ তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। এই সকল কথা তিনি পুত্রকে গোপন করিয়া কখন বলিতেন না, পুত্রের সম্মুখে এইরূপ অন্যায় তিরস্কার প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হইত। পশুপতি অনেক সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সে সহ্যগুণেরও একটা সীমা আছে, আজ কি জানি কেন হঠাৎ সে সীমা অতিক্রম করিল। পশুপতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"মা, এ তোমার কি আক্কেল! স্ত্রীলোক বাঁঝা হ'লে তার কি অপরাধ? এর জন্য ওকে যখন

তখন এমন করে গাল দেওয়া তোমার উচিত নয়। কোন দোষ করে, তার জন্য তুমি গাল দিতে পার, কিন্তু আমিত ওর কোন দোষ দেখিনি।"

পশুপতি পূর্ব্বে কখন এরূপ প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জননীকে কোন কথা বলেন নাই। আজ অকস্মাৎ পুত্রের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া জননী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর পুত্রবধূকে ছাড়িয়া ভীষণ গর্জ্জনে পুত্রের উপর পড়িলেন। পুত্র যতদূর পারিল, জননীর সম্মান রাখিবার চেষ্টা করিল, মাতা যতদূর পারিল, পুত্রকে দুর্ব্বাক্য বলিল। কিন্তু তাহাতেও জননীর ক্রোধের উপশম হইল না; শেষে জননী সেই অপরাহ্নে আপনার সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কারাদি লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তারাসুন্দরী শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক কাঁদিল, কত অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, শেষে এই অপরাধে প্রহার পর্য্যন্তও খাইল, তত্রাচ জননীর ক্রোধের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া একবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তারাসুন্দরী অনেকদূর শাশুড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, কিন্তু তত্রাচ তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। তখন তারা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিল—"বসে ভাব্‌ছ কি? শিগ্‌গীর যাও, রাগ হ'লে মার যে জ্ঞান থাকে না, তা কি তোমার মনে নাই?"

পশুপতি নাগ বলিলেন—"মনে সব আছে, কিন্তু আর ভাল লাগে না। আর এ অপরাহ্নে তিনি যাবেন কোথা?"

তারা পুনরায় বলিল—"তা বলে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায় ? হাজার হ'ক মা—তুমি আর দেরি করো না।"

অগত্যা পশুপতি নাথ মাতার অনুসন্ধানে চলিলেন। তখন তারাসুন্দরী একলা বসিয়া একমনে কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কোথা হইতে একখানা অন্ধকার হঠাৎ আসিয়া ধীরে ধীরে তারার হৃদয় অধিকার করিতে বসিল। এ দিকে গৃহের মধ্যেও অন্ধকার ধীরে ধীরে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছিল। তারাসুন্দরীর কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না। তারা বিষণ্নমনে আপনার অদৃষ্টচিন্তায় মগ্না। এমন সময় চারি দিকে শাঁক, ঘণ্টা, কাঁশর প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। তারা অমনি চম্‌কিয়া উঠিল। তখনও তাহার গৃহে সন্ধ্যাজ্বালা হয় নাই। দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া তারা সন্ধ্যা জ্বালিতে গেল।

সন্ধ্যা জ্বালা শেষ হইলে পশুপতি নাথ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"না, তাঁকে আন্‌তে পার্‌লাম না। এত সাধ্‌লাম, কিছুতেই তাঁর রাগ গেল না।"

তারা বিষণ্নমনে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি তিনি এই রাত্রেই কামদেবপুর চলে গেলেন ?"

পশুপতিনাথ উত্তর করিলেন—"না কামদেবপুর যান্ নাই, তিনি বিষী পিসীর বাড়ীতে আছেন।"

এই "বিষী পিসী"—বিশ্বেশ্বরী পিসীমাতা ঠাকুরাণীর অপভ্রংশ মাত্র। তাঁহার বাড়ী পশুপতির বাড়ী হইতে অধিক দূর নয় ; সুতরাং তারাসুন্দরী তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি নয়টার সময় তারাসুন্দরী স্বামীকে আহারাদি করাইয়া তামাক সাজিয়া দিল। পশুপতি নাথ সট্‌কার নলটি মুখে তুলিয়া লইয়া অন্যমনস্কে টানিতে লাগিলেন। মাতার সহিত কলহ করিয়া পুত্রের মন বড়ই অন্যমনস্ক হইয়াছে, আর তারার মুখখানিও আজ বিষণ্ণ, সুতরাং আজ আর স্ত্রীপুরুষে সেরূপ সময়োচিত কোন কথাবার্ত্তা হইতেছিল না, উভয়েই এক প্রকার নীরব। অনেকক্ষণ পরে তারাসুন্দরী বলিল—"তোমায় একটি কথা বল্‌বো?"

পশুপতির মন তৎক্ষণাৎ তারার কথায় আকৃষ্ট হইল; পশুপতি বলিলেন—"কি কথা তারা, বল।"

তারা। আমার কথা রাখ্‌বে কি?

পশু। রাখ্‌বার কথা হ'লে অবশ্যই রাখ্‌বো। আমি তোমার কোন্ কথা রাখি নাই তারা?

তারা সুন্দরী তখন স্বামীর চরণে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি আর একটি বিয়ে কর, মার কষ্ট আর আমি দেখ্‌তে পারিনি।"

পশুপতি ধীরে ধীরে তারাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল—"তাতে যে তোমার কষ্ট বাড়্‌বে তারা।"

তারা। মাকে সন্তুষ্ট করতে পার্‌লে—আগেকার মতন মার হাসি মুখ দেখতে পেলে, আমি সে কষ্ট সহ্য করতে পার্‌বো।

পশু। তোমার ছেলে হলো না বলে, মা যে তোমায় যখন

তখন বকেন, এটি মায়ের বড় অন্যায়—এতে তোমার অপরাধ কি ?

তারা স্বামীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"মা যে আমায় এখন বকেন, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষে—এতে মার কোন দোষ নাই। দেখ, আমি যখন আড়াই বৎসরের, তখন আমার মা মরে যান্। আমি মার ভালবাসা ছেলে বেলায় পাইনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে, আমার [illegible] আর নাই। আজ যেন মা আমার অদৃষ্টের দোষে আমায় দেখ্‌তে পারেন না. কিন্তু ১০।[illegible] বৎসর তিনি আমায় যেরূপ ভালবেসেছেন আর যত্ন করেছেন তা কি আমি কখন ভুল্‌তে পার্‌বো ?"

পশু। মার সে স্বভাব আমি জানি, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি 'ছেলে হলোনা ছেলে হলোনা' করে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তারা। আমিত সেই জন্যই বল্‌ছি, তুমি আর একটি বিয়ে কর।

পশুপতি এবার তারার মুখের প্রতি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তারা, তোমার মতন স্ত্রী ঘরে থাক্‌তে আমি আবার বিয়ে কর্‌বো ? নাই বা ছেলে হলো—আমি ছেলে চাই না।"

তারা। তুমি চাও না, কিন্তু মা চান্। মাকে সন্তুষ্ট করা কি ছেলের কর্ত্তব্য নয় ?

পশু। আর তুমি—তোমার প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই—তারা ?

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে পশুপতির চক্ষু অশ্রুজল ভারাক্রান্ত ও স্বর অস্পষ্ট হইল। এইবার তারাসুন্দরী আরম্ভ করিল—"মায়ের তুলনায় আমি কে? মা যদি উচ্চে হিমালয় পর্ব্বত হন, তবে তাঁর তুলনায় আমি একটি বালুকাকণা মাত্র। আমিত মায়ের দাসী। তুমি কুলীন, আজ মনে কর্‌লে তুমি একশটা বিয়ে কর্‌তে পার, আমি সেই একশটা দাসীর মধ্যে একজন দাসী মাত্র! শাস্ত্রে আছে—পিতামাতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌লে সকল দেব[illegible]তা সন্তুষ্ট হন। যে পুত্র পিতামাতাকে সন্তুষ্ট না রাখ্‌তে পারে, সে অন্য কোন পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগী হয় না। তার কখনই ভাল হয় না। মা অসন্তুষ্ট থাক্‌লে তোমার অমঙ্গল হবে। তোমার অমঙ্গল হবে জেনে কি আমি নিশ্চিন্তি থাক্‌তে পারি?"

পশুপতি আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি আমার অমঙ্গলের দিকে দেখ্‌ছো, আর আমি তোমার অমঙ্গলের দিকে দেখ্‌বো না? আমি কি এম্‌নি পাষণ্ড?"

আপনার বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষু মুছিয়া দিয়া মুক্তাফলের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রুশোভিতনয়নে তারা ধীরে ধীরে বলিল—"মার কথা একবার ভাব্‌বে না?"

পশু। মা বড় নির্ব্বোধ, তাঁর বুদ্ধি থাক্‌লে তিনি কি আর তোমায় অযত্ন করেন?

তারা। সে আমার অদৃষ্ট। আর সুধু মা কেন? তোমার একটি সন্তান হলে আমিও সুখী হবো। তুমি মার এক সন্তান, তোমার সন্তান না হলে আমার শ্বশুরের বংশ লোপ হবে। মা ত অন্যায় কথা বল্‌ছেন না। আর আমি কি কেবল আমার নিজের সুখের দিকেই দেখ্‌বো?

সৌহৃদ্য ছিল। তিনি যখন পুত্রের উপর রাগ করিয়া বিশ্বেশ্বরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বিশ্বেশ্বরী বিশেষ আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিল। তিনি যে রাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বিশ্বেশ্বরী জানিতে পারিয়াছিল। জননীর পশ্চাতেই পশুপতি সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন মাতাপুত্রে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতেই পশুপতিজননীর রাগের কারণ জানিতেও বিশ্বেশ্বরীর বাকি রহিল না। পশুপতি অনেক অনুনয়েও জননীর সে রাগের হ্রাস করিতে না পারিয়া বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। জননী সে রাত্রি বিশ্বেশ্বরীর গৃহেই অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন বেলা দুইপ্রহরের সময় বিবিপিসীর বাড়ীতে পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নবীনা, প্রবীণা ও বৃদ্ধা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই ছিল। আহারাদির পর এইরূপ সমাগম প্রায় প্রত্যহই হইত। এ বাড়ীতে কোন পুরুষ না থাকায় এটি একটি পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা হইয়া পড়িয়াছিল। পাড়ার স্ত্রীমহলের সকল ঘটনার সমালোচনাই এই স্থানে হইত। আজও সেইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সমাগত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার এসময়েও নিষ্কর্ম্মা ছিল না। কোন বৃদ্ধা তুলা পিঁজিতে পিঁজিতে গল্প করিতেছিল, কোন প্রবীণা সেলাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াই তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। একজন নবীনা কারপেট বুনিতেছিল, আর তাহারই পার্শ্বে একজন বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিতেছিল আর একজন প্রৌঢ়া পুত্রকে স্তনপান করাইতে করাইতে পাড়ার

কোন একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক ঘটনাকে গুরুতর করিয়া তুলিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, নির্ব্বোধ পুত্র সে ঘটনার গুরুত্ব না বুঝিতে পারিয়া ক্রন্দনের দ্বারা জননীর সে চেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মাইতে ছিল, এবং তজ্জন্য স্নেহময়ী জননীর নিকট ভর্ৎসিত ও প্রহারিত হইতেছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল একজন রাশিকৃত সুপারি কাটিতেছিল, বাকি সকলই নিষ্কর্ম্মা।

এমন সময় অন্য এক প্রবীণা কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গৃহকর্ম্ম, গল্প, কথাবার্ত্তা, সমালোচনা সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল—সকলই অবাক্ হইয়া প্রবীণার দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী প্রথমেই প্রশ্ন করিল —"কি হয়েছে রামের মা?"

তখন সেই সমাগত রমণীমণ্ডল হইতে 'কেন কাঁদিস্ রামের মা?' 'রাম ভাল আছে ত?' 'বউ কি প্রসব হতে পারে নাই?' 'ছেলে হয়ে মারা গেছে বুঝি' ইত্যাদি চারিদিক হইতে একবারে প্রশ্নবৃষ্টি হইতে লাগিল। রামের মা কাহার প্রশ্নের উত্তর দিবে? তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় আজীবন অভ্যস্ত ক্রন্দনের মাত্রা তখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। রামের মার ক্রন্দন দেখিয়া সকলই ভীতা হইল, একটা যে ভয়ানক বিপদ সঙ্ঘটন হইয়াছে—একথা সকলের মনেই ধারণা হইয়া গেল। তখন পুনরায় চারিদিক হইতে সান্ত্বনার ধূম পড়িয়া গেল। 'আহা' 'উহু' 'কাঁদিস্‌নে' 'কি কর্‌বি বল্' প্রভৃতি বাক্যে অনেকেই সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা রামের মার অশ্রুজল দেখিয়া নিজের অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু

তাহাদের মধ্যে কেহই রামের মার ক্রন্দনের কারণ তখন পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দনের পালা শেষ হইলে ক্রন্দনের সুরেই রামের মা বলিল—"অদেষ্ট দেখেছিস্ বোন্—অদেষ্ট দেখেছিস্—এবারেও একটা মেয়ে!"

বিপদ আশঙ্কার সহিত বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে বিশ্বেশ্বরী বলিল—"দুটো মেয়ের উপর আবার একটা মেয়ে!"

বিশ্বেশ্বরীর সে স্বর বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যেরূপ ভঙ্গিমার সহিত এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল, যে কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদও যেন এ সংবাদ অপেক্ষা প্রার্থনীয় ছিল। কিন্তু কথাটা রামের মার মনোমত হওয়ায় তাহার শোক-সাগর পুনরায় উথলিয়া উঠিল। এবার স্পষ্ট কাঁদিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"এত অষুধ খাওয়ালুম, বাবা ঠাকুরের দোর ধরলুম, তবু ছেলে হলো না গা? এমন অদেষ্ট কোথাও দেখছ?"

তৎক্ষণাৎ কাদম্বিনী নাম্নী এক প্রৌঢ়া বলিল—"সত্যি দিদি, প্রথম মেয়ে হলেই গা ধস্‌কে যায়, তার ওপর উপ্‌রি উপ্‌রি তিন তিনটে মেয়ে হলে কি আর রক্ষে আছে গা?"

কাদম্বিনীর জলদগম্ভীর স্বর থামিতে না থামিতেই তাহারই পার্শ্ববর্ত্তিনী সৌদামিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কেন গা? মেয়ে কি ফ্যাল্‌না না কি? আজ কাল ছেলে হতে কি সুখ হয়? এই দেখ না আমার ছেলে হতে কি সুখ হয়েছে? ভাগ্যি

শেষ দশায় মেয়েটা হয়ে ছিলো, তাই এখনও পেটে খেতে পাচ্ছি —জাত রক্ষে হয়েছে।”

রামের মা তখন চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—“আমাদের কি তেমন অদেষ্ট দিদি, মেয়ে তিনটের বিয়ে দিতে হলে যে ভিটে বেচ্‌লেও কুলাবে না।”

পশুপতিজননী এতক্ষণ আপনার মনের অসুখে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এইবার আরম্ভ করিলেন—“আহা! আমার পশুপতির যদি একটা মেয়ে হতো, তা হলেও তাকে নিয়েও আমি সুখী হতে পারতুম।”

বিশ্বেশ্বরী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—“মেয়ের বর মাগিস্‌ না বউ, মেয়ের বর মাগিস্‌ না। পশুপতির কুষ্টিতে যখন ছেলে হবে লেখা আছে, তখন তোর কোন ভাবনা নাই, তুই ছেলের বিয়ে দে, তা হলেই নাতীর মুখ দেখ্‌তে পাবি।”

রামের মা এইবার পুনরায় অশ্রুর প্রস্রবণ ছাড়িয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুদীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ করিল—“আহা! বড় ছুঁড়ির কি কষ্ট! এবার গণক-ঠাকুর গণে ছেলে হবে বলেছিলো বলে, ছুঁড়ির ধারণা হয়েছিল যে নিশ্চয় ছেলে হবে। আঁতুর ঘরের সাম্‌নে মেয়ের পাল শাঁক নিয়ে বসে রইলো, ছেলেরা সন্দেশ খাবে বলে উঠান-ময় নেচে কুঁদে বেড়াতে লাগ্‌লো, রাম আমার ছেলের মুখ দেখবে বলে একবার সদরবাড়ী আর একবার ভিতরবাড়ী কর্‌তে লাগ্‌লো, এমন সময় বউমা প্রসব হয়ে পড়্‌লো। ধাইমাগী ভারি সেয়ানা, পাছে মেয়ে হয়েছে শুনে বউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাই ছেলে হয়েছে বল্লে। মেয়ে গুলো অম্‌নি সত্যি ছেলে

হয়েছে মনে করে, শাঁক বাজিয়ে দিল। পাড়ার ছেলে গুলো আহ্লাদে চিৎকার করে উঠলো। রাম তখন সদরবাড়ীতে ছিলো, আহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে বাছা আমার ভিতর বাড়ীতে দৌড়ে এলো। আমি পোড়াকপালী তখন ঠাকুরের রান্না রাধ্‌ছিলুম, এত আহ্লাদ হলো, যে সে কথা তখন আর মনে নাই, তাড়াতাড়ি দৌড়ে একবারে আঁতুড়ের ভেতর গেলুম। ওমা, গিয়ে দেখি আমার পোড়া কপাল পুড়ে গিয়েছে—এবারও বউয়ের এক মেয়ে! বউছুঁড়ি ছেলে হয়েছে মনে করে, সেই মেয়েটার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রয়েছে; কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। আমি যেতেই বউ আমার দিকে চেয়ে বল্লে—'মা, কি ছেলে হয়েছে মা, আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।' আমি বল্লুম—'তোমার যেমন অদেষ্ট, তেম্‌নি ছেলে হয়েছে মা।' আমার কথা শুনেই আর এক সর্ব্বনাশ!"

বিশ্বেশ্বরী তখন আগ্রহের সহিত বলিল—"আবার সর্ব্বনাশ কি! এর চেয়ে আবার কি সর্ব্বনাশ হতে পারে?"

রামের মা চক্ষের জল মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল—"বউ অজ্ঞান হয়ে গেল, আমার তখনত আর হাত পা এলো না। ভাগ্যি ধাই মাগী ছিল, তাই মুখে চখে জল দিয়ে অনেক কাণ্ড করতে তবে আবার জ্ঞান হলো। পাড়া শুদ্ধ মেয়ে ছেলের আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে গেলো, মনের দুঃখে যে যার ঘরে চলে গেল। তখন রামের মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যেতে লাগ্‌লো। বাছার আমার মুখ খানি শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটি যেন ছল্‌ ছল্‌ কর্‌ছে। বাছা সদর বাড়ীতে গিয়ে একবারে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো। এ সকল দেখে আর কি ...

ভিটেতে টিকৃতে পারা যায় বোন ? না আর ঘর সংসার ভাল লাগে ? তাই তোদের কাছে পালিয়ে এলুম।"

বিশ্বেশ্বরী তখন রামের মাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"আহা ! তা বই কি, বেশ করেছ দিদি, বেশ করেছো। শরীরটা জালাতন হলে কি আর ঘরে মন বসে। এই দেখ না, পশুপতির মা জালাতন হয়ে কাল থেকে আমার বাড়ীতে পালিয়ে এসে রয়েছে।"

এমন সময় ধীরে ধীরে আর এক নূতন আগন্তুক সেই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহার সঙ্গে আর একজন স্ত্রীলোক ছিল, সে কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। এই নূতন আগন্তুক অন্য কেহ নহে, ইনি আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা তারাসুন্দরী। আর যে স্ত্রীলোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেই মুখরা বিধুমুখী।

পুত্রবধূকে দেখিয়া পশুপতি জননীর মুখ কিছু গম্ভীর হইল। বিশ্বেশ্বরী তৎক্ষণাৎ 'এস মা, এস' বলিয়া তারা সুন্দরীকে আদর করিল। এখানে একত্রে অনেকগুলি স্ত্রীলোক দেখিয়া তারা বড় অপ্রস্তুত হইল। গৃহস্থের কুলবধূ হইয়া এত স্ত্রীলোকের সম্মুখে কিরূপে আসিয়া দাঁড়াইবে ? কিরূপে ইহাদের সম্মুখে শাশুড়ীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, কিরূপে বাহিরের লোকের নিকট সমস্ত ঘরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে—তারা তখন অধোবদনে এই সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অন্য কথা না তুলিয়া তারা বলিল—"মা, ঘরে চল। অনেক বেলা হয়েছে, আমি তোমার জন্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত রেঁধে বেড়ে হাঁড়ি নিয়ে বসে রয়েছি।"

পশুপতি জননী তখন গম্ভীরমুখ অধিকতর গম্ভীর করিয়া বলিল—"আমার জন্যে কারো হাঁড়ি নিয়ে বসে থাক্‌তে হবে না। কেন গা—আমার একটা পেট বইত নয়। আমি না হয়, ভিক্ষে মেগেই খাব। আমি যাদের ভালর জন্যে মরি, তারা যদি সে ভাল বুঝ্‌তে না পারে, তবে তাদের নিয়ে আমার সংসার করার দরকার কি ?"

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতেই জননীর চক্ষে জল আসিল। তারা সুন্দরী তখন আর থাকিতে পারিল না, শ্বশ্রুঠাকুরাণীর চরণে ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। সে দৃশ্য দেখিয়া অনেকেরই প্রাণে আঘাত লাগিল। সৌদামিনী তখন বলিল—"বউ মানুস, এতদূর তোমায় সাধ্‌তে এসেছে, আর কি তোমার রাগ করা ভাল দেখায় দিদি, যাও ঘরে যাও।"

পশুপতি জননী তৎক্ষণাৎ বলিল—"আমার আর ঘর কন্নায় দরকার নেই বোন।"

তারা সুন্দরী আপনার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"মা, তোমার কষ্ট দেখে, আমি অনেক জেদ করে তাকে বিয়ে করতে রাজী করেছি, তুমি ক'নের ঠিক কর মা, আর যাতে এই মাসেই বিয়ে হয়, তাই কর।"

পশুপতি জননী এতক্ষণ পরে পুত্রবধূর মুখের প্রতি চাহিল। তারা সুন্দরীর কথা শুনিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোক সকলও অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বিশ্বেশ্বরী আরম্ভ করিল—"বউ, দেখ্‌লি. আমিত বলেছি, তোমার বউয়ের মতন লক্ষ্মী বউ ভূভারতে নেই। হাজার হ'ক বড়,ঘরের মেয়ে. কি না। তা মা, তুমি যদি ছেলেকে রাজী করে থাক, তা হলে

ক'নের ভাবনা কি? আমি আজই বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।"

এইবার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেই গম্ভীরমুখ যেন প্রফুল্ল হইল, রাহুগ্রস্থ পূর্ণশশি হঠাৎ রাহুমুক্ত হইলে যেরূপ হয়, পশুপতি-জননীর মুখখানিও সেইরূপ আকার ধারণ করিল। তারাসুন্দরী বিশ্বেশ্বরীকে বলিল—"পিসী মা, তুমি তবে শিগ্‌গীর ক'নের ঠিক্ কর।"

পশুপতিজননীর মুখে অমনি ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল. তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন—"যদি দক্ষিণপাড়ার শ্যাম চাটুর্য্যের মেয়ে ঠিক্ করতে পার, তবে আর কোন সম্বন্ধ চেষ্টা কর্‌বার দরকার নেই অমন সুন্দর বড় মেয়ে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।"

বিশ্বেশ্বরী এইবার আহ্লাদে হাত মুখ নাড়িয়া বলিল—"বড় মনে করে দিয়েছিস্ বউ, আহা মেয়েত নয়, যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। আর তারাও মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না বলে মাগী মিন্সেতে ভেবে ভেবে আধ্‌খানা হয়ে গেছে। এ কথা শুন্‌লে তারাত স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাবে, কারণ দেনাপাওনার পেড়াপিড়ী হবে না। আজ কাল মেয়ের বিয়ে দেওয়াত আর সোজা কথা নয়? আমি আজই বৈকালে গিয়ে একথা পাড়্‌বো।"

সৌদামিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, বিশ্বেশ্বরীর কথা শেষ হইলেই বলিল—"নেই বা ছেলে হলো গা, অমন সোণারচাঁদ বউ ঘরে থাক্‌তে আবার বউয়ের সাধ কেন? আবার বিয়ে দিলে কিন্তু নাতীর মুখ

দেখ্‌তে পাও আর না পাও, দুই সতীনের ঝগড়ার মুখ রোজ দেখ্‌তে পাবে। সতীনের জ্বালায় অমন লক্ষ্মীবউও তখন অলক্ষ্মী হয়ে দাঁড়াবে। এমন কাজও করে! আর কি সেকাল আছে, যে কুলীনের ছেলে যত ইচ্ছে বিয়ে কর্‌বে। এখন আইন আদালত করে কুলীনের ছেলের কাছেও খোরাকী আদায় করে নিতে পারে। কে তোমায় এমন বুদ্ধি দিয়েছে পশুপতির মা?"

পশুপতি জননীর তখন মনটা পুনরায় ভার ভার হইল। আর সে কথায় বিশ্বেশ্বরীর প্রাণেও সৌদামিনী যেন একটা ভয়ানক বজ্রাঘাত করিল। বিশ্বেশ্বরী তখন মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"যে যা ভাল বোঝে, সে তা কর্‌বে, এতে বার জনের কথায় দরকার কি? মাগী মনের দুঃখে পাগল হবার উপক্রম হ'য়েছে; তা হলেই কি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়?"

কথাটা যে সৌদামিনীকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইল, তাহা সৌদামিনীর তৎক্ষণাৎ বুঝিতে বাকি রহিল না, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর এ কথার উত্তর করিতে তাহার আর সাহস হইল না। বিশ্বেশ্বরীকে যে চিনিত, সেই ভয় করিত।

সৌদামিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া বিশ্বেশ্বরী আর সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া পশুপতি জননীকে বলিল—"বউমার এখনও বুঝি খাওয়া হয় নাই, ভাল মানুষের মেয়েকে আর কষ্ট দিও না। এখনি যাও।"

পশুপতি জননী তখন বিশ্বেশ্বরীকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া অনেকক্ষণ গোপনে কি কথা কহিল, তাহার পর বধুমাতার সঙ্গে আপন গৃহে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি জননীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, আজ পশুপতির বিবাহ। পাত্রী দক্ষিণ পাড়ার সেই শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়েরই কন্যা; সুতরাং গৃহিণীর আজ আর আনন্দের সীমা ছিল না। বিশ্বেশ্বরীই এই বিবাহের ঘটকী, সুতরাং তাহার প্রভুত্ব আজ দেখে কে? তারা সুন্দরী আজ বড়ই ব্যস্ত, বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্যোগই স্বহস্তে করিতেছে, তাহারও মনে কণামাত্র বিষণ্নতা নাই। গ্রামের কর্ত্তারা আজ হয় কন্যাকর্ত্তার বাড়ী, না হয় বরকর্ত্তার বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহাদেরও আজ আনন্দের সীমা ছিল না। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বৈকাল হইতে কন্যা-কর্ত্তার বাড়ী গুলজার করিয়া বসিয়াছে; তাহাদের হাসি মুখ দেখিয়া নিরানন্দ কোথায় পলায়ন করিয়াছে। গ্রামের বালক-বালিকাগণের অধরেও আজ আর আনন্দ ধরে না। বিবাহের উৎসবের ন্যায় হিন্দুর এমন উৎসব আর আছে কি? পশু-পতির এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আজ তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করি-তেছেন, তত্রাচ আজ যেন সমস্ত গ্রাম আনন্দে ও উৎসবে পরিপূর্ণ।

সকলের হৃদয় আজ আনন্দে ও উৎসবে পরিপূর্ণ, কেবল যাহার বিবাহ সেই পশুপতিই আজ নিরানন্দ। পশুপতির মনে আজ আর কিছুমাত্র সুখ নাই, পশুপতি বিষণ্ন মনে আজ আপ-নার অবস্থার বিষয় ভাবিতেছে। তাহার সমবয়স্ক অনেক বন্ধুবান্ধব আজ তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন, তাহারা আজ আনন্দের

দিনে অনেক প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে, পশুপতি বাহ্যিক আকারে সে সকল ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রতি বিরক্তভাব প্রকাশ না করিলেও মনে মনে কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে মুখে কাষ্ঠহাসি প্রকাশ করিলেও অন্তরে যে এক ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন, তাহা বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। গোধূলি লগ্নেই বিবাহ, সুতরাং সে যন্ত্রণা হৃদয়ের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়া পশুপতি চক্ষের জল গোপন করিতে করিতে অন্তঃপুরে বরসজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন।

কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া পশুপতি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে আর সে চক্ষের জল গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। পশুপতি দেখিলেন তারাসুন্দরী হাসি মুখে তাঁহারই বিবাহের বরণডালা স্বহস্তে সাজাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহারই বরসজ্জার সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকেই সাজাইতে আসিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া পশুপতি কি আর স্থির থাকিতে পারে? তৎক্ষণাৎ স্মৃতিসাগর মোহিত করিয়া অজস্র অশ্রুবিন্দু তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল, পশুপতি কোন ক্রমেই সে অশ্রু আর গোপন করিতে পারিলেন না।

পশুপতির চক্ষে অশ্রুজল দেখিয়া রমণীগণের আনন্দ ও উৎসবের তরঙ্গ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমরা কোন কথা গোপন করিব না, সে অশ্রুজল দেখিয়া তারাসুন্দরীর নয়নপ্রান্তেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা অন্য কেহ দেখিতে পায় নাই। পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া জননীর কিন্তু বড় রাগ হইল। তিনি রাগে অভিমানে যেন ফুলিতে লাগিলেন। একটু সুস্থির হইয়াই আরম্ভ করিলেন—"ঢের ঢের ছেলে দেখিছি বাপু;

কিন্তু এমন ছেলে আমার বাপের বয়সে কখন দেখিনি। শুভ-কর্ম্মের সময় কিনা চক্ষের জল ফেলা! আমাদের যেন এ সকল সাধ আহ্লাদ হয়ে গেছে, কিন্তু যে ভাল মানুষের মেয়েকে ঘরে আন্‌ছি, তার বাপ মায়ের এ মেয়ের বিয়ে এইত প্রথম সাধ আহ্লাদের সময়, তারা এ সকল অমঙ্গলের কথা শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে। গ্রামের মধ্যে বিয়ে, আমি কার মুখ ঢাকা দিয়ে রাখ্‌বো গা?"

পশুপতি তখন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"মা, আমি ইচ্ছে করে চখের জল ফেলি নাই; আমি অনেক চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু কি জানি কেন আজ যেন কোন মতেই চখের জল রাখ্‌তে পাচ্ছি না।"

বিবী পিসী তখন আসরে নামিয়া বলিল—"আমি কোন কথা না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি নে। তুমিত বাপু, কুলীনের ছেলে, বিয়ে করাই তোমাদের ব্যবসা। তা এতে আর কান্নাকাটির পালা এলো কোথা থেকে। তোমায় আজ কেউ ধরে জেলে দিচ্ছে না?"

পশুপতি মনে মনে বলিলেন—"জেল এর চেয়ে প্রার্থনীয় ছিল।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"পিসী মা, আমি আর চখের জল ফেল্‌বো না, কি কি কর্‌তে হবে তোমরা শিগ্‌গীর শেষ করে নাও।"

তখন আর কেহ কোন কথা কহিল না, আবশ্যকীয় কর্ম্ম সকল যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়, সে পক্ষে সকলই মনোযোগী হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকগণের পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ ও উৎসব আর দেখা গেল না।

শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না, সেই দিন গোধূলিলগ্নে পশুপতিনাথের বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেল। পরদিন নববধূ লইয়া পশুপতি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ক'নে তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর কোন কথায় তারা স্তম্ভিত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল!

সে কথা অন্য কিছু নয়, বিশ্বেশ্বরী বলিল—"তোমার কি ক'নে তুল্‌তে যাওয়া ভাল হয়? লোকে কথায় বলে সতীনের চেয়ে মেয়ে মানুষের শত্রু আর নেই, তুমি সেই সতীন ত? তোমার তুলে কাজ নেই, তোমার শাশুড়ী ক'নে তুল্‌বে।"

বিশ্বেশ্বরীর কথায় তারা মনে বড় ব্যথা পাইল। আহা! বড় আহ্লাদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ক'নে তুলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাধা পাওয়ায় তারার মন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। গতরাত্রে তারা নিদ্রা যাইতে পারে নাই, তত্রাচ অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বরক'নে আসিবার প্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। যাহা হউক, পশুপতির জননীই বরক'নে তুলিলেন। কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও নববধূকে কোলে তুলিতে পারিলেন না। কারণ বধূমাতা নিতান্ত বালিকা ছিল না, বয়স ত্রয়োদশ বৎসর এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত। নববধূকে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া তারাসুন্দরী কিন্তু আর থাকিতে পারিল না, এবার দৌড়িয়া গিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তাহার পর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বরক'নে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

যথা সময়ে ফুলশয্যা, পাকস্পর্শ প্রভৃতি শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। নববধূ যে কয়েক দিবস শ্বশুরালয়ে রহিল, তারাসুন্দরী

তাহাকে বিশেষ যত্ন ও আদর করিতে কোনরূপ ত্রুটি করে নাই। বাস্তবিক, এ কয়েক দিবস তারা সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য অবহেলা করিয়াও নববধূকে যত্ন ও আদর করিত। কিন্তু কেমন অদৃষ্টের দোষ, ইহাতেও বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি কেহ কেহ নানা কথা কহিত, কারণ স্ত্রীলোক হইয়া সপত্নীকে এরূপ যত্নও আদর করা —এরূপ দৃশ্য তাহাদের চক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তাহারা নিজের প্রকৃতি অনুরূপ তারাসুন্দরীর এইরূপ আদর ও যত্নের প্রতি নানারূপ দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিল।

বিবাহের পর পশুপতিজননীরও আনন্দের সীমা নাই। পুত্রের প্রথম বিবাহকালে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, এ আনন্দ যেন তাহা অপেক্ষাও মাত্রায় কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পশুপতিরও এখন আর চক্ষে সে অশ্রুজল নাই, হৃদয়ে কোনরূপ আনন্দের তরঙ্গও নাই। পশুপতি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গম্ভীর হইয়াছেন, আর যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। একটা প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ স্থিরভাব ধারণ করে, পশুপতিও এখন যেন সেইভাব ধারণ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সময় কাহার অপেক্ষা করে না। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এই সর্ব্বজয়ী সময় নীরবে অবিরাম চলিয়াছে। কি আলো, কি অন্ধকার, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা কেহই সময়ের গতিরোধ করিতে

পারে না। মূল্যাদ্বারা এ পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যায়, কিন্তু এই সময়কে কেহ ক্রয় করিতে পারে না।

সময় অনন্ত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ এইরূপ কতযুগ যে সময় পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? সুতরাং সময়ের আদি আমরা কিরূপে স্থির করিব? সত্য, ত্রেতা দ্বাপর গিয়াছে, এখন কলি চলিতেছে। কলির পর আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি আসিবে; এইরূপই ক্রমাগত চলিবে। সুতরাং সময়ের অন্ত আমরা কোথায় পাইব?

সময় দ্রুতগতিতে অনন্তকাল চলিয়াছে, কাহার মুখাপেক্ষা করে না, মুহূর্ত্তের জন্য একবার পশ্চাতে ফিরিয়াও দেখে না—অবিরাম সমভাবে চলিয়াছে। আমরা চলিয়াছে বলিতেছি বটে, কিন্তু সময় কোনরূপই পদচিহ্নও রাখিয়া যায় না। ধন্য সময়! ধন্য তোমার মহিমা!!

এইরূপ সময়ের অনিবার্য্যগতিতে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পশুপতির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চারুশীলা এখন পশুপতির গৃহে আসিয়াছে। পশুপতির জননী এখন এই নববধূমাতাকে পাইয়া আহ্লাদে অধীরা হইয়াছেন। এখন সাংসারিক অন্য কাজকর্ম্ম তিনি আর দেখেন না, কেবল এই নববধূকে লইয়াই ব্যস্ত। প্রথমত বধূর আহারাদির সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, আপনার পুত্র অপেক্ষাও এখন এই নববধূর আহারাদির ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর সে আহারাদি যাহাতে ঠিক নিয়মিত সময়ে হয়, সে বন্দোবস্তেরও কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। নববধূর বস্ত্রাদিও

তারাসুন্দরীর বস্ত্রাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, গৃহিণী নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ হইতে নববধূমাতার জন্য উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। এত করিয়াও গৃহিণীর মনের তৃপ্তি হইল না, গৃহিণীর যাহা কিছু অর্থ ও অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল, সেই সমস্ত দ্বারা নববধূর উত্তম উত্তম অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইরূপ অতিরিক্ত আদরে, যত্নে, অশনে, বসনে ও ভূষণে নববধূ প্রতিপালিতা হইতে লাগিল। আর এক কথা—গৃহিণী নববধূকে কোনরূপ গৃহকর্ম্ম করিতে দিতেন না। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে গৃহিণী বলিতেন—"বাপ্‌রে এ আমার অনেক কষ্টের বউ, আমি অনেক কেঁদে কেঁদে তবে এ বউকে পেয়েছি। আমি কি ছোট বউমাকে কোন সংসারের কাজকর্ম্ম করতে দিতে পারি ?"

তারাসুন্দরীর যতদূর সাধ্য সপত্নীকে যত্ন ও আদর করিতে ত্রুটি করিত না। সহোদরা ছোট ভগিনীকে পাইলে জ্যেষ্ঠা ভগিনী যেরূপ আহ্লাদিতা হয়, তারাসুন্দরী চারুশীলাকে পাইয়া সেইরূপ আহ্লাদিতা হইয়াছিল। গৃহিণীর এরূপ অন্যায় পক্ষপাত তারাসুন্দরীর নির্ম্মল মনকে কিছুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে নাই ; বরং তারা প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর আদেশমত চারুশীলার আহারাদি সম্বন্ধে যে বিশেষত্ব ছিল, তাহা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া দিতেন। গৃহিণী উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিলে, তারা স্বহস্তে তাহা সতীনীকে পরাইয়া দিত, ইহা ব্যতীত নিজের যে সকল উত্তম বস্ত্র ছিল, তাহাও সতীনীর ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত থাকিত। গৃহিণীদত্ত নূতন অলঙ্কার লইয়া তারাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে সতীনীকে সাজাইত। তাহার নিজের কোন

অলঙ্কারেও তারা যদি সতীনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বোধ করিত, তবে তৎক্ষণাৎ সে অলঙ্কার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া চারুর অঙ্গ শোভা করিত।

কিন্তু সপত্নীর প্রতি তারার এই সকল আদর ও যত্নে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সপত্নী হইয়া সপত্নীকে এরূপ আদর ও যত্ন করা বিশ্বেশ্বরীর পক্ষে বড়ই অসহ্য হইল। সেই কারণ বিশ্বেশ্বরী ইহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। চারুশীলাকে নির্জ্জনে পাইলেই বিশ্বেশ্বরী উপদেশ দিত—"দেখিস্ মা, সতীনকে কখন বিশ্বাস করিস্ না আমার বড় ভয় করে মা, কোন্ দিন বা খাবারের সঙ্গে তোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ছুঁড়ি ভারি সেয়ানা—ঐ দেখ না, শাশুড়ীর দেখাদেখি তোকে এত আদর যত্ন করে, তা নইলে সতীনকে কেউ কখন আবার আদর করে থাকে মা?" আহা! বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলি কি মধুমাখা!

সপত্নীর প্রতি বঙ্গবধূর বিদ্বেষভাব চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং বিশ্বেশ্বরীর অমূল্য উপদেশের ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না, চারুশীলা তারাসুন্দরীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, এবং তাহার সম্পর্কে না থাকিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তাহার পর গৃহিণীর এইরূপ অযথা পক্ষপাতের ফলও ফলিতে আরম্ভ করিল. সে ফলের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করিব।

এখন পশুপতির সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা বলিব। পশুপতি জননীর এরূপ অন্যায় পক্ষপাতের দরুণ মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেন, তবে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদের ভয়ে প্রকাশ্যে

কোন কথাই বলিতেন না। আর গৃহিণী যখন নিজ ব্যয়ে চারু-শীলার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া দিতেছেন, তখন সে বিষয়ে তাঁহার কোন কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনাও করিতেন না। পশুপতি কিন্তু দুই স্ত্রীকে সমান চক্ষে দেখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যখন নিজে কোন দ্রব্য উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেন, দুই স্ত্রীকে সমান মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ পক্ষপাত করিতেন না। তবে গৃহিণীর ইহা বড়ই অসহ্য বোধ হইত। প্রকাশ্যে কোন কথা পুত্রকে বলিতেন না, কিন্তু শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে মাতাপুত্রে মনান্তর আরম্ভ হইল। সে ঘটনাটি এই—

চারুশীলার অলঙ্কাররাশির মধ্যে তাহার চন্দ্রহার ছড়া রূপার ছিল। কিন্তু রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করা আজ কাল বাঙ্গালার স্ত্রীলোকে দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করেন। পূর্ব্বে রূপার গহনার যে আদর ছিল, এখন তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। সে কালে ধনাঢ্য জমীদার পত্নীও রূপার পঁইচে, রূপার তাবিজ, রূপার বালা ব্যবহার করিয়া আপনা-দিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহারা স্বর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতেও অপমান বোধ করেন। স্ত্রীলোকের এই অলঙ্কারপ্রিয়তার দরুণ হিন্দুগৃহস্থের ক্রিয়াকলাপ ক্রমে লোপ পাইতেছে, এবং হিন্দুর একান্নবর্ত্তীপ্রথা এখন নানা দোষের আকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং চারুশীলার অল-ঙ্কারের সমালোচনা যখন পাড়ার স্ত্রীমহলে হইত, তখন তাহার রূপার চন্দ্রহারের কথা উত্থাপন করিয়া সকলই একবাক্যে এরূপ অসঙ্গত অলঙ্কারসমাবেশের নিন্দা করিত। চারুশীলা কোন

নিমন্ত্রণে যাইলে সেই অসংখ্য স্ত্রীমণ্ডলেও একথা উঠিত, সুতরাং চারু লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া যাইত। এই কারণ চারুশীলা সে চন্দ্রহার আর পরিত না, এবং চন্দ্রহারের অভাবে কোন নিমন্ত্রণেও আর যাইত না। গৃহিণীর প্রাণে ইহা বড়ই আঘাত লাগিল, কিন্তু তাঁহার নিকট এখন আর এক কপর্দ্দকও নাই, সুতরাং নববধূর চন্দ্রহারের ভার পুত্রের প্রতি অর্পিত হইল। পুত্র পশুপতি বড়ই বিপদে পড়িলেন। ছোট স্ত্রীকে চন্দ্রহার দিতে হইলে, বড়স্ত্রীকেও দিতে হয়, তাহাতে অন্তত এক হাজার টাকার আবশ্যক। এত টাকা তাঁহার নিকট না থাকায় পশুপতি মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। এই সূত্রেই মাতাপুত্রে একদিন বিলক্ষণ বচসা আরম্ভ হইল।

মাতা বলিলেন—"দুছড়া চন্দ্রহারের কোন দরকার নেই, ছোট বউকেই এক ছড়া গড়িয়ে দে। আহা! ছেলে মানুষ—সোণার চন্দ্রহার পরবার সাধ হয়েছে, না দেওয়া কি ভাল দেখায়?"

পুত্র বলিলেন—"মা, তুমি একছড়া গড়িয়ে যাকে ভালবাস, তাকে দিতে পার, কিন্তু আমার যখন দুই স্ত্রী, তখন আমি দুছড়া না গড়িয়ে সে চন্দ্রহার ঘরে আন্‌তে পারি না।"

মাতা। আমার হাতে টাকা থাক্‌লে আর তোকে গড়িয়ে দিতে বলি?

পুত্র। আমারও এত টাকা নাই যে আমি সোণার চন্দ্রহার গড়িয়ে দি।

মাতা। যদি একখানা গহনাই দিতে না পারবি, তবে ভাল মানুষের মেয়েকে বিয়ে কর্‌লি কেন?

পুত্র। আমি ইচ্ছে করে এ বিয়ে করিনি, তুমিই জোর করে এ বিয়ে দিয়েছ।

এইবার মাতার আর সহ্য হইল না, পুত্র স্বইচ্ছায় বিবাহ করে নাই, তিনিই জোর করিয়া এ বিবাহ দিয়াছেন, এ কথা মাতার বড়ই অসহ্য বোধ হইল। তখন তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া পুত্রকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে করিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর ক্রোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিশ্বেশ্বরী পিসী আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করিল—"হাঁ বাবা, তুই কেমন ধারা ছেলেরে বাবা? আহা, ছোট বউ—ছুদের মেয়ে, যদি একটা আবদারই করে থাকে, তার সঙ্গে অন্য কারু সঙ্গে কি আর ধরতুব্যি আছেরে বাবা? আর ধর্ম্ম কথা বলি—বড় বউয়ের কি আর সোণার চন্দ্রহার পর্‌বার বয়েস আছে? সময়ে ছেলে মেয়ে হলে যে এতদিন নাতি, নাতিনী হো'ত। এতে বড় বউয়ের হিংসা করা কি ভাল কাজ হয়েছে?"

পশুপতি কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু এই সময় ধীরে ধীরে তারাসুন্দরী আসিয়া বিশ্বেশ্বরীকে ডাকিয়া বলিল—"পিসী মা, আমি কেন হিংসে কর্‌বো? বরং ছোট বউয়ের চন্দ্রহার হলে আমার এতে আহ্লাদ হবে। তুমি তোমার ছেলেকে বল, যদি হাতে টাকা না থাকে, তবে আমি হাতের বালা, গলার চিক্ আর কাণের মাকৃড়ী খুলে দিচ্ছি, তাই ভেঙ্গে ছোট বউকে চন্দ্রহার গড়িয়ে দিন্।"

তখন বিশ্বেশ্বরী পশুপতিকে ডাকিয়া বলিল—"শুন্‌লি বাবা,

ভাল মানুষের মেয়ের কথা শুন্‌লি? আহা! ছোট বউয়ের মুখ দেখ্‌লে এম্‌নি ইচ্ছে সকলেরই হয়। মাগীত বউ—বউ করে সারা হয়ে গেল। কি লক্ষ্মীকে তোর ঘরে এনে তুলে দিয়েছি তা বল্‌। বড় বউ নিজের গহনা সব খুলে এনে দিতে চাচ্ছে। তা টাকা না থাকে, আপাতক তাই নয় নিয়ে, চন্দ্রহার গড়িয়ে দাও, তার পর বড়বউকে হাতে টাকা হ'লে তখন সে গহনা গড়িয়ে দিও।"

পশুপতি মনে মনে বলিলেন—"চারুশীলা নিশ্চয় কোন যাদু জানে।" প্রকাশ্যে বিশ্বেশ্বরীকে বলিলেন—"আচ্ছা, পিসী আমি চন্দ্রহার গড়িয়ে দেব, তুমি মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

তখন বিশ্বেশ্বরী হাসিতে হাসিতে চারুশীলাকে সে সংবাদ দিয়া পশুপতিজননীকে নিজে সঙ্গে করিয়া গৃহে রাখিয়া গেল। কিন্তু যতদিন সে চন্দ্রহার প্রস্তুত না হইল, ততদিন জননী পুত্রের সঙ্গে ভালরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন না। পশুপতি কিন্তু তারাসুন্দরীর অবশিষ্ট অলঙ্কার কয়েকখানায় হস্তার্পণ না করিয়া সে চন্দ্রহার প্রস্তুত করিয়া আনিল, ইহাতে কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর সে চন্দ্রহার দেখিয়া ততদূর আনন্দ হইল না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্তরূপ পক্ষপাতে এবং বিশ্বেশ্বরীর উপদেশে ছোট বধূর স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ছোট বধূর এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাহারই সুখের জন্য এ সংসারে সকলই লালায়িত, সুতরাং কেবল সুখভোগ করা ভিন্ন তাহার স্বামীগৃহবাসের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এত যত্ন ও এত আদর স্বত্বেও বধূমাতার কখন তাঁহার প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা বা ভক্তির উদ্রেক হয় নাই, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীও সে বিষয়ে বধূমাতার নিকট কোন প্রত্যাশাও করেন না। এক গৃহিণীর দোষে যে সংসারে নানা বিভ্রাট ঘটে, আমাদের পশুপতি জননীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পশুপতি জননী যদি একজন পাকা গৃহিণী হইতেন, তাহা হইলে একজন ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকাকে এরূপ অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতেন না।

এই বিশ্বসংসার যে নিয়মে চলিতেছে, একটি ক্ষুদ্র সংসারেও আমরা সেই একই নিয়ম প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাই। যে স্থানে পক্ষপাত, অত্যাচার, অধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবেশ করে, সেই স্থানই সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বশীভূত হইয়া শীঘ্রই ছারখার হইয়া যায়। পশুপতিজননী স্বহস্তে যে বীজ আজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন, অচিরেই তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় পশুপতি আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে তাঁহার ছোট স্ত্রী চারুশীলা নানা বেশভূষায় ভূষিতা

হইয়া খাটের উপর শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করি-তেছে। সন্ধ্যার সময় পত্নীকে খাটের উপর শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া পশুপতি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং সন্ধ্যার সময় এরূপ অলসভাবে থাকিবার জন্য রাগান্বিত হইয়া ডাকিলেন—"চারু।"

চারু তৎক্ষণাৎ একবার বঙ্কিমদৃষ্টে স্বামীর প্রতি চাহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। পশুপতির আর কোন-রূপ ভৎর্সনা করা হইল না। চারুর সেই মোহিনী বেশ আর অধর প্রান্তের সেই ঈষৎ মৃদু হাসি দেখিয়াই পশুপতির ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। পশুপতি তখন একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"এ সময় শুয়ে থাকা—"

পশুপতির কথা শেষ হইতে না হইতেই চারুশীলা বলিল—"বারে! আমি কি কেবল শুয়ে আছি, আমি যে বই পড়্‌ছি।"

পশু। বই পড়তে আমি নিষেধ কর্‌ছি না, তবে কি না এই ভরা সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকাটা ভাল নয়।

চারু। তবে তুমি আফিষ থেকে এসেই সন্ধ্যের সময় খানিকক্ষণ শুয়ে পড়ে থাক কেন?

পশু। আমি খেটেখুটে আসি, তাই একটু বিশ্রাম করি।

চারু। দিনের বেলায় মা ঘুম পাড়ায়, তাই সন্ধ্যের সময় গা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করে বলে আমি শুয়ে থাকি।

পশু। মা তোমার যে পরকাল খাচ্চেন।

চারু। কিসে?

পশু। তোমায় কোন কাজকর্ম্ম কর্‌তে দেন না।

চারু। আমি কাজ কর্‌বো কেন?

পশু। কেন কর্‌বে না—সকলইত করে।

এইবার চারুশীলা চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল—"আমি যে তোমার ছোট স্ত্রী।"

পশুপতির আর সে ভাব নাই, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ছোট স্ত্রী হ'লে বুঝি আর কাজকর্ম্ম কর্‌তে নেই—এ কথা তোমায় কে বল্লে?"

চারুশীলা তখন হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি ঠাকুরমার মুখে যত রাজার গল্প শুনেছি, সকল রাজারই তুই রাণী। আর সকল বড় রাণীই ধান ভাঙ্গে আর কুঁড়ে করে দাসীর মতন থাকে, আর ছোট রাণীরাই কেবল পায়ের উপর পা দিয়ে ঐশ্বর্য্যভোগ করে।"

চারুশীলা দেখিল এ কথায় পশুপতির মুখ যেন একটু বিষণ্ণ হইল। তখন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পশুপতির দাড়ি নাড়িয়া বলিল—"বলি ও রাজা মশাই, আমি যে তোমার সেই ছোট রাণী।"

পশুপতি এবার জোর করিয়া একটু হাসিলেন, বাহিকে প্রফুল্লভাবও প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে কি একটা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পশুপতি তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তবে কি তারাসুন্দরী সেই গল্পের বড় রাণী হলো নাকি?" প্রকাশ্যে বলিলেন—"দেখ চারু, বড়-বউ তোমায় কত ভালবাসে, বড় ভগিনীকে যেরূপ——"

পশুপতির কথায় বাধা দিয়া চারু বলিল—"বড়বউ ভাল বাস্‌বে না ত কি—সে ভালবাসা তাঁর নিজের ভালর জন্যে।"

পশু। তাকেও তোমার একটু ভালবাসা উচিত।

পশুপতির কথা শুনিয়া চারুশীলার মুখখানি প্রথমে গম্ভীর-ভাব ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে সেই শুভ্র মুখারবিন্দ আবার ঈষৎ রক্তিমাভ হইল, চারু বিরক্তিভাবে বলিল—"আমি ডাইনীর মায়া দেখাতে চাই না।"

পশুপতি ত অবাক্! চারুশীলা কি বহুরূপী? ঐ সুন্দর মুখ এত সুন্দর দেখায় কেন? কিন্তু পশুপতি এবার সে সৌন্দর্য্য-স্রোতে ভাসিয়া গেলেন না, বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাইনীর মায়া আবার কি?"

চারুশীলা, পুনরায় সেই অকস্মাৎ-অধিকতর-সৌন্দর্য্যরাশি-পরিপূর্ণ মুখখানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যকিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে বলিল—"ডাইনীর মায়া কাকে বলে জান না? এই সতিনী হ'য়ে সতিনীকে ভালবাসা—একে ডাইনীর মায়া বই আর কি বল্‌বো?"

পশুপতিও এ কথা শুনিয়া কিছু গম্ভীর হইলেন। কি একটা চিন্তা তখন তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু চারুশীলা তাঁহাকে অধিকক্ষণ সে অবস্থায় থাকিতে দিল না। তাড়াতাড়ি আপনার বাক্স খুলিয়া দুইটি ইয়ারিং বাহির করিয়া পশুপতির সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"দেখ দেখি, কেমন দুটি ইয়ারিং!"

পশুপতির অবনত মুখ উন্নত হইল। পশুপতি চাহিয়া দেখিলেন, চারুশীলা এবার হাস্যময়ী! এ হাসির কি মোহিনী শক্তি, আমরা জানি না; কিন্তু এ হাসি তৎক্ষণাৎ পশুপতির সে গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিল। শশধর, রাহুকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল!

পশুপতি ধীরে ধীরে বলিল—"এ ইয়ারিং কোথায় পেলে ?"

চারু। পাবো কোথায় ? একজন বেচবে, তোমায় কিনে দিতে হবে।

পশু। কত দাম ?

চারু। পঞ্চাশ টাকা।

পশু। এমন আর একজোড়া পাওয়া যায় না কি ?

চারুশীলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আর একজোড়া কি হবে ?"

পশুপতি থতমত খাইয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, চারুশীলার সে প্রফুল্ল হাস্যময়ী মূর্ত্তি আর নাই, সেই ক্রোধঅভিমানপরিপূর্ণ আরক্তিম মুখভঙ্গিমাও এখন আর নাই, চারুশীলা এখন অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সে মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্করী—সে মূর্ত্তি সর্ব্বরসাতলদায়িনী !

পশুপতি সাবধান ! পশুপতি তখন ভয়ে জড়সড় ; সুতরাং আর কিরূপে সাবধান হইবেন ? লিখিতে লজ্জা করে, পশুপতি তখন পশুর অধম হইলেন—আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, মিথ্যা কথা বলিলেন—"আমি দু'জোড়াই তোমার জন্য কিন্‌তে চাই।"

কিন্তু কথাটা বলিবার সময় একটা মূর্ত্তি বিদ্যুৎবেগে আসিয়া পশুপতির হৃদয়ে একটা ভয়ানক আঘাত করিল, এবং সেইরূপ বিদ্যুৎবেগেই সেই মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ কোথায় চলিয়া গেল। ছি ! পশুপতি ছি ! এত শীঘ্র তুমি হৃদয়ের বল হারাইলে ?

পশুপতি এখন আর সে পশুপতি নাই। ছোট স্ত্রী চারু-শীলার সুখের জন্যই এখন পশুপতি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নূতন বিলাস-দ্রব্য—এইরূপ প্রতিদিনই নূতন নূতন উপহার। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেরূপ অগ্নির দর্প বৃদ্ধি হইয়া থাকে, পশুপতির এই সকল উপ-হারে প্রতিদিন চারুশীলার দর্পও সেইরূপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি পশুপতির উপহারের আর বিশ্রাম নাই। তারা-সুন্দরীর কথা এখন আর পশুপতির মনে হয় না। তারার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই এখন যেন পশুপতির মুখ শুখাইয়া যায়—পশুপতি অপরাধীর ন্যায় ভয়ে জড়ষড় হইয়া থাকেন। সুতরাং যাহাতে তারার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, পশুপতি, তাহার জন্য সর্ব্বদাই পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেন; এবং আবশ্যক হইলে নানা উপায়ও উদ্ভাবন করিতেন। এতদিন পরে তারার সেই অতুলনীয় সহ্যগুণ এখন শেষ সীমায় আসিয়াছে। একি তারা!—তোমার চক্ষে জল! আর এখানে আমরা এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না, তারার জন্য আমাদের প্রাণ আকুল হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সত্যই কি তারার চক্ষে জল! এত শীঘ্র এরূপ অসম্ভব ঘটনাও কি সম্ভব হইয়াছে? সেই চিরপ্রফুল্ল ও চিরজ্যোতির্ম্ময়ী চক্ষুকে যে এত শীঘ্র অশ্রুকণা-সংযুক্ত দেখিতে হইবে, একথা আমরা স্বপ্নেও কখন মনে করি নাই। তবে কেন এমন হইল?

নিশ্চয় অন্য কোন ভয়ানক অসম্ভব ঘটনার সহিত এই অসম্ভব ঘটনার কোন সম্বন্ধ আছে। পশুপতির মনের পরিবর্ত্তনের সহিত কি এ ঘটনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না? এইবার আমরা কূল পাইয়াছি।

কিন্তু যে তারা অম্লান-বদনে এতকাল এত অত্যাচার, এত পক্ষপাত সহ্য করিয়া আসিল, সে তারা হঠাৎ সে সহ্যগুণ হারাইল কেন? রমণী-হৃদয়ের এ গূঢ়রহস্য কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে?

এদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, গাধা সকল বহিতে পারে, কিন্তু কেবল ভাতের কাটিটা বহিতে পারে না। রমণী হৃদয়ও সেইরূপ। সে হৃদয় সকল অত্যাচার, সকল শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, কেবল স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত-থাকা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। যতদিন তারাসুন্দরীর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসেন, ততদিন তারা অম্লানবদনে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এখন সে বিশ্বাসের বল হারাইয়াছে; সেই কারণেই আমরা তারার চক্ষে আজ অশ্রুজল দেখিতেছি।

তারার এই অশ্রুজলের অর্থ বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে। তারার হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কিছুই নাই। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পক্ষপাতে তারার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তাঁহার নানাপ্রকার অত্যাচার ও গঞ্জনাও তারা অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। স্বামী নানাপ্রকার নূতন নূতন দ্রব্যাদি আনিয়া তাহারই সম্মুখে তাহারই সতিনীকে প্রতিদিন উপহার দিতেছেন, স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও তারা সেজন্য

একদিন একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে নাই। যে তারার হৃদয়ে এত বল, আজ হঠাৎ তাহার চক্ষে অশ্রুজল কেন? আর এক কথা, যে তারা একদিন স্বামীকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল—'তুমি বিবাহ কর, তোমার শতশত দাসীর মধ্যে একজন দাসী বলে গণ্য হ'লেই আমি সুখী হব"—আজিকার এই ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ঐ অশ্রুজল, এ কি সেই সুখের পরিচয়? আমরা তাই বলিতেছিলাম, তারার আজিকার এ অশ্রুজলের অর্থ বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে।

আমরা এ কি করিলাম? নিস্বার্থ প্রণয়ের সুন্দর ছবি আঁকিতে গিয়া তারার চক্ষে অশ্রুজল সাজাইলাম কেন? আজকাল এদেশে নিষ্কাম-ধর্ম্মের যেরূপ ছড়াছড়ি, বোধ হয় এতক্ষণ কোন নিষ্কাম-ধর্ম্মাবলম্বী পাঠক সমস্ত মাটী হইল বলিয়া গ্রন্থকারকে গালি দিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু আমরা কি করিব? একথা জানিয়াও এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা তারার সে অশ্রুজল বন্ধ রাখিতে পারিলাম না।

যে তারা স্বহস্তে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে, সে তারা কি আপনার হৃদয়ের বল বুঝিতে পারে? আর এক কথা—সে যে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইবে এরূপ কথা স্বপ্নেও কখন তারার মনে উদয় হয় নাই। এরূপ ঘটনা যে কখন সম্ভব হইতে পারে, তাহাও তারার মনে বিশ্বাস ছিল না। সে ভালবাসায় অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তারা অম্লান-বদনে সেই সকল অত্যাচার এতদিন সহ্য করিতে পারিত। কিন্তু আজ সে বিশ্বাস হারাইয়াছে বলিয়াই তারার চক্ষে অশ্রুজল! তারার অপরাধ এই যে, তারা নিষ্কাম নয়, তারা প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে

ভালবাসিয়া থাকে, এবং সে ভালবাসার প্রতিদান কামনা করে। যে তারার এত গুণ, সে নিষ্কাম হইয়া স্বামীকে ভালবাসিতে পারে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, তারা পূর্ব্বেই স্বামীর ভালবাসার স্বাদ পাইয়াছিল। (যে রমণী একবার সে ভালবাসার স্বাদ পায়, সে আর কি কখন সে স্বাদে বঞ্চিতা থাকিতে পারে? রমণী হৃদয়ের এ গূঢ় রহস্য যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই তারার অশ্রুজলের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।)

ধীরে ধীরে চারুশীলা এখন পশুপতির হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। পশুপতিরও এবিষয় বুঝিতে বড় বাকি ছিল না। প্রথম প্রথম পশুপতি ইহার জন্য নিজেও বিশেষ দুঃখিত ছিলেন, এবং তাঁহার এরূপ ব্যবহার যে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইতেছে, মনে মনে একথাও স্বীকার করিতেন। তারাসুন্দরীকে সম্মুখে দেখিলেই নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বড়ই লজ্জিত হইতেন। কিন্তু শেষে এ লজ্জাও আর রহিল না। পশুপতি চারুশীলাকে লইয়াই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে চারুশীলার প্রভুত্ব এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিতে পশুপতির সাহস হইত না। এখন আর চারুশীলা তারাসুন্দরীকে স্বামীর সম্মুখে পর্য্যন্ত যাইতে দিত না। তারা রন্ধনাদি কার্য্য স্বহস্তে সমস্তই করিবে, কিন্তু চারুশীলা সে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া লইয়া গিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে আনিয়া স্বামীকে আহার করাইবে। তারাসুন্দরীর জন্য যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিতে পর্য্যন্ত পশুপতির প্রতি চারুশীলার অনুমতি ছিল না সুতরাং পশুপতিও সে গৃহে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। যদি দৈবাৎ ভুলক্রমে কখন পশুপতি

তাঁরার ঘরে প্রবেশ করিতেন, তবে চারুশীলার আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। চারুশীলা স্বামীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিত, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তারাসুন্দরীও বিনা অপরাধে ভর্ৎসিত হইত। পশুপতির ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই এখন চারুশীলার গৃহে শোভা পাইত, পুরাতন জীর্ণবস্ত্র একখানা পর্য্যন্ত আর তারাসুন্দরী গৃহে থাকিত না। একদিন এক জোড়া অব্যবহার্য্য পুরাতন জুতা বিধু ঝি তারার গৃহে রাখিয়াছিল; চারুশীলা তাহা দেখিতে পাইয়া এমন কোন্দল আরম্ভ করিল যে, কোন্দলে সর্ব্বজয়ী বিধুমুখী পর্য্যন্তও অধোমুখী হইল। একদিন ছাদ হইতে কাপড় তুলিয়া আনিতে ভুলক্রমে তারাসুন্দরী স্বামীর একখানা আটপৌরে কাপড় অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গে আপনার গৃহে তুলিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। চারুশীলা তাহা জানিতে পারিয়া, এমন কোন্দল আরম্ভ করিল যে, সেদিন আর বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না।

পশুপতি চারুশীলার এই সকল অন্যায় ব্যবহারের কোনরূপ শাসন করিতে সাহসী হইতেন না; বরং সময়ে সময়ে চারুশীলার পক্ষই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। আর একদিনের একটা ঘটনার কথা আমাদের মনে হইয়াছে। এক রবিবার পশুপতির এক মাতুল আসিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার আহারের স্থান তারাসুন্দরীর গৃহেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভাগিনেয়ের সহিত একত্রে আহারের প্রস্তাব করায়, পশুপতিকেও বাধ্য হইয়া তারাসুন্দরীর গৃহে আসিয়া আহার করিতে হয়। তারাসুন্দরীই তাঁহাদের পরিবেশন করে। আহারান্তে মাতুল মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলে তারা, সুযোগ পাইয়া পশুপতির নিকটে গিয়া

তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, এবং অনেক অনুনয়বিনয় করিয়া বলিল—"একটু বস, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আছে। তারাসুন্দরীকে দেখিয়াই পশুপতির মুখ শুকাইয়া গেল। পশুপতি আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে বলিলেন—"এখন বস্‌তে পার্‌বো না, এখন যাই; আমায় একটু ঘুমুতে হবে।"

তারা।—তবে এইখানেই ঘুমও।

পশু।—তোমার বিছানা যে ময়লা, ও বিছানায় শুলে আমার ঘুম হবে না।

তারা একথায় চক্ষের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, একবিন্দু চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"আমি ফর্‌সা বিছানা কার জন্য কর্‌বো? তুমি আর এ বিছানায় শোয় না। সুধু বিছানা কেন—একবার এ ঘরের চার্‌দিকে চেয়ে দেখ দেখি, পূর্ব্বে ঘরের কি শোভা ছিল, আর এখন কি হয়েছে। এ সকলই তোমার জন্য। আচ্ছা, আমি ভাল করে ফর্‌সা বিছানাই করে দিচ্ছি।"

তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি একখানা বাসি করা চাদর লইয়া পাতিয়া দিতে গেল; কিন্তু পশুপতি বাধা দিয়া বলিলেন—"তোমার অত কষ্ট কর্‌বার দরকার নেই। এখন আমার শোবার সময় নাই; বিশেষ দরকার আছে, বাইরে যাই।"

তারা।—আমার কাছে একটু থাকৃতে হলেই তোমার যত কাজ! কেন, আমি কি তোমার স্ত্রী নই?

পশুপতি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার এসকল কথা হিংসায় পরিপূর্ণ, একজনের উপর হিংসা করা কি ভাল? আর, তবে নাকি তোমার হিংসা নাই?"

তারা। আমি হিংসে করা কাকে বলে জানি না। একথা বল্যে যদি হিংসে করা হয়, তবে অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর। এখন আমার মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে; দিন দিন আমার বুদ্ধিশুদ্ধিও যেন লোপ পাচ্ছে। তুমি আমার মন ভাল করে দাও, আমায় উপদেশ দাও, আমায় ভর্ৎসনা কর। তুমি স্বামী—সাক্ষাৎ দেবতা। তোমার উপদেশ পেলে, আমি নিশ্চয় ভাল হবো। তোমার পায়, পড়ি, তুমি আমায় ভাল কর। আমি—

বলিতে বলিতে তারাসুন্দরীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, সাধ্বী স্বামীর চরণে লুটিয়া পড়িল। এমন সময় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে চারুশীলা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। চারুকে দেখিয়াই পশুপতির হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তাহার পর কি হইল? তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, সে বিষয় বর্ণনা করিতে আর আমাদের প্রবৃত্তি হয় না!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পশুপতির সংসারে ক্রমে বড় গোলযোগ বাধিল। এতকাল পশুপতির জননীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, সাংসারিক সমস্ত খরচপত্র তিনিই স্বহস্তে করিতেন, ভাণ্ডার হইতে যাহাকে যাহা দিতেন, সে তাহা পাইত—পশুপতির জননীর বিনা অনুমতিতে একজন ভিখারীও মুষ্টান্ন-ভিক্ষা পাইত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জননীর এ কর্ত্তৃত্ব আর রহিল না। তাঁহার বড় সাধের বধূমাতা সমস্ত অধিকার করিয়া বসিল; সুতরাং সংসারে

একটা বড়ই গোলযোগ বাধিয়া গেল। এ গোলযোগের মূল কারণ, সেই বিশ্বেশ্বরী দেবী ওরফে বিশ্বী পিসি। কিরূপে তাহা ঘটিল, বলি শুন।

একদিন বৈকালে বিশ্বেশ্বরী চারুশীলাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—"হাঁ ছোট্ট বৌমা, তুই কি চিরকালই এমনি গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটিয়ে দিবি, সংসারের কিছুই দেখ্‌বিনে! তার পর মাগী মরে গেলে, তোর দশা হবে কি?"

অন্য কেহ এরূপ মৃদু ভর্ৎসনা করিলে কি হইত জানি না, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর এই ভর্ৎসনায় চারুশীলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"পিসিমা, সংসার যখন ঘাড়ে পড়্‌বে, তখন কি আর আট্‌কাবে?"

বিশ্বেশ্বরী স্থির কটাক্ষে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"সে অন্যের পক্ষে বটে, কিন্তু তোর সংসারে তোর যে বাঘিনী সতীন রয়েছে! এই বেলা সব বুঝে যদি না নিস্‌, তবে এর পর পস্তাতে হবে বাছা!"

বিশ্বেশ্বরীর এক কথাতেই চারুশীলার যেন চৈতন্য হইল, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে চারুশীলার কোন কথা বুঝিবার আর বাকি রহিল না। চারু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"পিসিমা, আমি অতখানি বুঝ্‌তে পারি না; কিন্তু—"

বিশ্বে। এতে আবার 'কিন্তু' আছে নাকি?

চারু।—না না—কেমন করে তা হবে, তাই বল্‌ছি।

বিশ্বে।—ওলো ছোট্‌কী! আমি মনে কর্‌লে কি না হয়?

চারু।—তা জানি; কিন্তু—

বিশ্বে।—আবার কিন্তু ?

চারু।—না—এই বল্‌ছিলাম কি, বেশ গায়ে ফুঁদিয়ে বেড়াচ্ছি, আমার আবার পোড়া পরিশ্রম সয় না, তা হলে পরিশ্রম কর্‌তে হবে ত ?

বিশ্বে।—তুই সে দিনের মেয়ে, এখনও আঁতুড়ের গন্ধ তোর গায়ে লেগে রয়েছে, তুই আবার পরিচ্ছেরম কর্‌’ব কি না ? আমি তোর সব কায করে দেবো ?

তাহার পর বিষী পিসি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে বলিল—“দ্যাখ, এই হাতে দু পয়সা হবে, যাকে যা দিবি, সেই তা পাবে, যাকে যা না দিবি, সে তা পাবে না। এতে সুখ কত ? হলই বা পরিচ্ছেরম ?”

পুনরায় এদিক ওদিক চাহিয়া পিসিমাতা কাণে কাণে আরম্ভ করিল—“যে তোকে জন্ম দিয়েছে, যে তোকে গর্ভে ধরেছে, একবার তাদের মুখের পানেও চাইবি না ? লোকে কন্যাপুত্রের বর মাগে কেন না ? তুই যেন সুখে আছিস, কিন্তু এ সুখ ত সেই বাপ মা হ’তে ! একবার তাদের অবস্থার দিকে দেখ্‌বি না ? তারা যে না খেতে পেয়ে মারা গেলে। তোর হাতে সংসার থাক্‌লে কি তাদের এত কষ্ট হয় ? তুইই বল মা বল্‌।”

বিশ্বেশ্বরীর চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল। চারুশীলা বুঝিল যে, বিষী পিসির মতন আত্মীয়া তাহার আর বিশ্ব সংসারে নাই। চারুশীলার হৃদয় সেই সহানুভূতিতে একবারে গলিয়া গেল ; চারু বলিল—“পিসিমা, কি কর্‌লে কি হয়, আমায় শিখিয়ে দাও ; তুমি না শেখালে আমায় আর কে শেখাবে ?”

এইবার বিশ্বেশ্বরীর চক্ষু হইতে টস্‌ টস্‌ জল পড়িতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বরী আপন অঞ্চলে সে জল মুছিয়া বলিল—"আমার বোনপো ত আমায় কাশি পাঠাবে বলে, খুলোখুলি কর্‌ছে, আমারও আর এখানে থেকে লাভ কি? কেবল শেষ দশায় তোর মায়াতেই পড়ে রয়েছি। অদৃষ্টে থাকে কাশি হবে, না হয় তোরাই আমায় গঙ্গায় টেনে ফেলে দিস্। তোদের মনে যা আছে করিস্; এখন যা বলি, শোন্। পশুপতিকে বল যে, মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করুন, আমরা থাক্‌তে তিনি সংসার নিয়ে জ্বালাতন হন্ কেন? তাঁর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনে, আমার ওপর সংসারের ভার দাও, তা হলেই তাঁর আর কোন ঝঞ্ঝাট থাক্‌বে না, তিনি পরকালের কাজ কর্‌তে পার্‌বেন।"

চারুশীলার আর আহ্লাদের সীমা নাই, পিসিমাতার মন্ত্রণানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত হইল। পিসিমাতা তখন সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রেই বিশ্বেশ্বরীর মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করা হইল। চারুশীলা যেরূপ যুক্তি দেখাইল, তাহাতে আর তাহাকে আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্য কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না। পরদিন প্রাতে পশুপতি, জননীকে ডাকিয়া বলিল—"মা, তুমি আর সংসারে কেন খেটে মর? তুমি এখন আপনার পরকালের কাজ কর। তোমার এখন বয়েস হয়েছে; এত খাট্‌লে আর ক'দিন বাঁচবে মা?"

পুত্রের এরূপ কথায় জননীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। জননী, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা, আমায় তুই কাশি পাঠিয়ে দিবি? তা' বাবা—তোর একটি

ছেলে হলেই আমি কাশী চলে যাব। আমি নাতির মুখ না দেখে স্বর্গে গিয়েও থাকতে পারবো না।"

পশুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমায় কাশী যেতে হবে না, এইখানেই থাক। তবে আপনার পূজা আহ্নিক কর; আর তোমায় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে জ্বালাতন হতে হবে না।"

জননী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে আবার জ্বালাতন কিরে বাবা! আমি পূজা-আহ্নিকের সময় পূজা আহ্নিকও করি, আবার সংসারের কাজকর্ম্মের সময় কাজকর্ম্মও করি। কই, আমি ত বাবা, কোনদিন এর জন্য কোন কথা বলিনি।"

পুত্র তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমারই ভালর জন্যই বলছি মা। তুমি ছোট বউয়ের উপর সংসারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও।"

অকস্মাৎ গৃহিণীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার সেই আহ্লাদ এখন বিষাদে পরিণত হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এখন হইতে সংসারে আর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, এখন হইতে তাঁহাকে তাঁহার বড় সাধের ছোট বধূমাতারই অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। দুই বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কোন ঘটনা হইলে, এতক্ষণ গৃহিণী ক্রোধে অধীরা হইয়া মহা-প্রলয় করিতেন; কিন্তু কি জানি কেন, নব-বধূমাতাকে গৃহে আনা অবধি গৃহিণীর সে ক্রোধের মাত্রা ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং গৃহিণী ক্রোধে অধীরা না হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন, —"ছোট বউমা যদি সংসারের ভার নিতে পারে, তবে আমার

আর এ সংসারে থাক্‌বার দরকার কি? আমায় তবে কাশি পাঠিয়ে দে।"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"কিছুদিন যাক্, তারপর তখন সে বিষয় বিবেচনা করা যাবে।"

এই কথা বলিয়া পশুপতি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে চারুশীলা বিধু ঝিকে ডাকিয়া বলিল,—"ও বিধু, বাজারের পয়সা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস্।"

গৃহিণী তখন গঙ্গাস্নান যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সে কথা তাঁহার কর্ণে গেল। তিনি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, যেরূপ একখানি পরিধেয় বস্ত্র ও পূজার দ্রব্যাদি লইয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে চলিয়া যান, সেইরূপ চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পশুপতির জননী ঘোরতর সংসারী ছিলেন, কিসে অল্প খরচে সংসার চলে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় দাসদাসীর দ্বারা সাংসারিক দ্রব্যাদি খরিদ তাঁহার মনোমত হইত না; অনেক সময় তিনি গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় নিজেই অর্দ্ধেক বাজার করিয়া আনিতেন, এবং যেখানে যে দ্রব্য খরিদ করিলে সুলভ হয়, কোনরূপ পরিশ্রমে কাতর না হইয়া সেইখানে সেই দ্রব্য খরিদ করিতে যাইতেন। অবশ্য পুত্র পশুপতি এ সকল ভাল বাসিতেন না, এবং ইহার জন্য মাতাপুত্রে অনেক সময় কলহও হইত। সাংসারিক খরচ হইতে গৃহিণীর কিছু কিছু সঞ্চয় করাও অভ্যাস ছিল।

সুতরাং আজ গৃহিণীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে; তাঁহার মুখের ছবিতে হৃদয়ের ভাবও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গার ঘাটে গিয়া আজ আর তিনি কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেছেন না, তাঁহার গম্ভীরমুখ দেখিয়া কেহ কোন কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও পারিতেছে না। পূজা-আহ্নিকের সঙ্গে সঙ্গে মা জাহ্নবীর জলে দাঁড়াইয়া পাড়ার কত পরিবারের চরিত্রের সমালোচনা হইতেছে, কত বধূর কুৎসা, কত বাল-বিধবার অপবাদ, কত কুল-কন্যার বেহায়ামী, কত ধনীর ধনের অহঙ্কার, কত মানীর মানের অহঙ্কার প্রভৃতির আন্দোলন চলিতেছে। যে পশুপতি-জননী এই সকল আন্দোলনের জীবন-স্বরূপ ছিলেন, আজ সেই পশুপতি-জননী সেই আন্দোলনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীরব! কোন আন্দোলনে যোগ না দিয়া নীরবে আজ তাঁহার গঙ্গাস্নান শেষ হইল, তাহার পর তিনি ঘাটের সিঁড়ির উপর পূজা-আহ্নিকে বসিলেন। কিন্তু আজ আর তাঁহার পূজা-আহ্নিক হইল না। তাঁহার মন আজ বড়ই অস্থির, সুতরাং পূজা-আহ্নিক কিরূপে হইবে? তিনি কেবল পুত্রের ও নববধূর ব্যবহারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কখন ক্রোধে অধীর হইতেছিলেন, কখন অভিমানে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই সকল অনর্থের তিনিই মূল; সুতরাং মনের ভাব কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। একে একে স্ত্রীমহল গৃহে চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার আজ আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্তি নাই। শেষে যখন বিশ্বেশ্বরীও চলিয়া যায়, তখন পশুপতি-জননী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"একটু দাঁড়াও।"

বিশ্বেশ্বরী দাঁড়াইল। কেন যে তাহাকে দাঁড়াইতে বলা হইল, তাহাও বুঝিল। উভয়ে তখন একত্রে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চলিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। শেষে বিশ্বেশ্বরী আরম্ভ করিল—"হাঁ বউ, আজ তোর মন এত ভার ভার কেন?"

পশুপতি-জননী তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"ঠাকুর-ঝি, তোকে আর কি বলবো? এইবার আমার নিজের সংসারে আমায় চোরের মতন থাকৃতে হবে। ব্যাটা ছোট বউয়ের এতদূর বশ হয়েছে যে, ছোট বউকেই এখন থেকে ঘরের গিন্নী করে দেওয়া হ'ল, আর আমি মা, দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিলুম, আমি এখন হলুম বাঁদী। ছোট বউয়ের হাততোলা এখন আমায় খেতে হবে। ঐ বিধু-ঝির যে মান আছে, এখন এ সংসারে আমার সে মানও নেই।"

ঠাকুর-ঝি অমনি অবাক্ হইয়া বলিল,—"সে কি! পশুপতি ত এমন ছেলে ছিল না! তবে কি ছোট বউয়ের চাঁদপানা মুখ দেখে সব ভুলে গেল না কি? তা দিদি, দুঃখ করলে আর কি হবে? শাস্ত্র ত আর মিথ্যে হবার যো নেই,—এখনকার কলিকালের ছেলে যে!"

বিশ্বেশ্বরী ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিল। কিন্তু সে মীমাংসা পশুপতির জননীর হৃদয়ে স্থান পাইল না। জননী তখন একটু রাগত হইয়া বলিলেন,—"শাস্ত্রে কি লেখা আছে যে, মাকে বাঁদী করে রেখে, স্ত্রীকে ঘরের গিন্নী করে রাখ্‌বে?"

বিশ্বেশ্বরী অমনি নরম হইয়া আরম্ভ করিল—"আর দিদি, শাস্ত্রের কথা এখন আর কে মানে? এখন কলিকাল যে।"

"কলিকালের মুখে আগুণ!" এই কথা বলিয়া, পশুপতি-জননী আবার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। এইবার বিশ্বেশ্বরী নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বরীর মিষ্ট কথায় পশুপতি-জননী জল হইয়া গেলেন, এবং তাহার ন্যায় হিতৈষিণী আর এ জগতে নাই এই কথা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। সেদিন গৃহে ফিরিয়া না গিয়া, বিশ্বেশ্বরীর সহিত তাহারই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বেশ্বরী বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার আহারাদির উদ্যোগ করিল, এবং অনেক সাধ্যসাধনার পর যৎকিঞ্চিৎ আহারও করাইল। বিশ্বেশ্বরী তখন সর্পবেশে দংশন করিয়া ওঝাবেশে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

পশুপতি-জননী গঙ্গাস্নান হইতে যখন আর গৃহে ফিরিয়া গেলেন না, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অনুসন্ধান হইত, এবং ক্রোধের কারণও প্রকাশ পাইত; কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর কৌশলে এ সকল আর কিছুই হইল না। বিশ্বেশ্বরী ভাবিল যদি এ সকল কথা শুনিয়া পশুপতির মনের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে তাহার এত পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইবে। সুতরাং ইহারই মধ্যে কৌশল করিয়া বিশ্বেশ্বরী পশুপতির গৃহে সংবাদ দিয়া আসিল যে আজ সে কয়েকজন ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করিয়াছে, সেই কারণ

গৃহিণীকে আজ তাহারই বাড়ী রন্ধনাদি করিতে হইবে; সুতরাং আজ আর তিনি বাড়ীতে আসিতে পারিবেন না।

বিশ্বেশ্বরীর কৌশলে সে দিন আর কেহ গৃহিণীর অনুসন্ধান করিল না। রাত্রে শয়ন করিয়া বিশ্বেশ্বরী বলিল—"হাঁ বউ বলি—এদের আক্কেলখানা কি? মাগী গঙ্গাস্নানে গিয়ে যে আর ঘরে ফিরে গেল না, তা গঙ্গায় ডুবে মলো—কি কোথায় চলে গেল, তার একবার খোঁজখবর নিলে না!"

কথাটা অনেকক্ষণ হইতে পশুপতি জননীর মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল, এবং ইহার জন্য তিনি প্রাণের ভিতর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাও অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। এখন তাঁহার সেই প্রাণের কথা বিশ্বেশ্বরীর মুখে শুনিয়া তাঁহার শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল, অবিশ্রান্ত চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল।

পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেখ্‌লি বোন্ দেখ্‌লি —আমার বৌমাটার আক্কেলখানা দ্যাখ্। তোরা যে বলিস্, পশুপতি বড় ভাল ছেলে, কেমন ভাল ছেলে তা তোরাই দ্যাখ্। এখন আর আমার খোঁজ কর্‌বে কেন? এখন আমি মলেই আপদ বালাই বিদেয় হয়।"

বিশ্বেশ্বরী অমনি আরম্ভ করিল,—"পশুপতি ত আটটার সময় খেয়ে আফিস চলে গেছে, ছোটবউ ছেলে মানুষ—মরুকগে তাকে ধরিনে, কিন্তু বড় বউ বুড়ো মাগী—ওর আক্কেলখানা কি? শাশুড়ী যে রাগের ভরে গঙ্গাস্নান করতে চলে গেছে, তা তুই জানিস্; সে মানুষ যখন সমস্ত দিনে ঘরে ফির্‌লো না, তখন

তুই কি করে নিশ্চিন্ত আছিস্? তাই বলি বউ, তোমার বড় বউয়ের পেটে পেটে নষ্ট বুদ্ধি।"

পশুপতির মা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,—"আমার অদেষ্টর গুণে বড় ছোট সব সমান হয়েছে। মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌বো না—বড় বউ তবু আমায় অনেক যত্ন আদর করে; এত যে হতশ্রদ্ধায় রয়েছে, তবু মুখে কথাটি নেই—যেন মাটির মানুষ। আর এ ছোটলোকের মেয়েকে কেন ঘরে এনেছিলেম, বোন? ছেলেও হলো না, আর আমার সোণার সংসার মাটি করে দিলে! ছেলেটিও এখন ছোট বউয়েরই গোলাম হয়েছে।"

বিশ্বেশ্বরী যে পথে যাইতেছিল, সে পথে যাওয়া এখন তত সুবিধাজনক বোধ করিল না; সুতরাং তখন আবার সোজা পথই ধরিল। একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"কি জান বউ, এ যে কলিকাল—এখন কি আর ভালর ভাল আছে? তুই যে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে ফের ব্যাটার বিয়ে দিয়ে ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলি, তা তোর মুখপানে একবার চাইলে না! সতীনে সতীনে আর কোন্ কালে ব'নে থাকে, আমি সে কথা ধরি না, কিন্তু শাশুড়ীর মান্যটা ত রাখা উচিত?"

পশুপতির মা বলিল,—"আর মান্য রেখে কাজ নেই বোন্। এখন বাড়ীতে থাকতে দিলে বাঁচি।"

বিশ্বেশ্বরী এবার একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,— "আমিও সেই কথাই ভাব্‌ছি। তা কি কর্‌বি বোন্? অন্য কেউ নয়, ব্যাটা আর বউ। লোক চলাচলি করা কি ভাল? কাদায় গুণ ফেলে তোকে থাক্‌তে হবে।"

পশুপতির মা।—আমি আর এ সংসারে থাক্‌বো না, আমি কাশি চলে যাব।

বিশ্বেশ্বরী।—কাশি যাবার সময় কি এখন তোর হয়েছে? আগে নাতীর মুখ দ্যাখ্‌, তার পর তখন কাশি যাস্‌।

পশুপতির মা।—না বোন্‌, আর নাতীর মুখ দেখ্‌তে চাইনে, নাতীতে আমার ঘেন্না জন্মে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী।—কি কর্‌বি বল, তুই ঘরের গিন্নী, তোকে সব সহ্য কর্‌তে হবে।

পশুপতির মা।—এখন আমি আর ঘরের গিন্নী নই। গিন্নী হলে কি আর আমি ভেসে ভেসে বেড়াই?

বিশ্বেশ্বরী।—বালাই, রাজা ব্যাটার মা, তুই ভেসে ভেসে বেড়াবি কেন? একটু সহ্য করে বউয়ের মন যুগিয়ে থাক্‌।

পশুপতির মা।—আমার অদেষ্টে শেষে কি এই ছিল?

পশুপতির মা আর থাকিতে পারিলেন না, পুনরায় কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিশ্বেশ্বরী মিষ্টকথার জাহাজ, নানারূপ মিষ্ট-কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর, পর-দিন প্রাতে গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। তবে পশুপতি জননী আর সাংসারিক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, কেবল দিনান্তে একবার স্বহস্তে পাকাদি করিয়া আহার করিবেন, আর পূজা আহ্নিক অথবা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া দিন কাটাইবেন। বিশ্বেশ্বরীরও উদ্দেশ্য এইবার সফল হইল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে পশুপতির সংসারে একটা মহাবিভ্রাট বাধিয়া গেল। পূর্ব্বে যে ব্যয়ে সংসার চলিত, এখন তাহার দ্বিগুণ ব্যয়েও সংসার চলা ভার হইয়া দাঁড়াইল। চাউল থাকিতে দাউল থাকে না, দাউল থাকিতে লবণ থাকে না, লবণ থাকিতে তৈল থাকে না, ইত্যাদি। পূর্ব্বে আট আনার বাজার খরচ করিলে সকলে যেরূপ পরিতোষের সহিত আহার করিত, এখন এক টাকার বাজারেও তাহাদের সেরূপ পরিতোষ আহার হয় না। সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে লাগিল। কি জিনিস কখন চাই, পূর্ব্বে তাহার কোন যোগাড়ই থাকিত না, সেই কারণ অর্দ্ধেক দিন পশুপতিকে আহার না করিয়াই আফিসে যাইতে হইত। সেই ভালমানুষের মেয়ে দাসীর প্রাণ ত ওষ্ঠাগত! এক দোকানে দিনের মধ্যে তের বার যাইতে হয়। তাই কি ছাই, একটিও মিষ্ট কথা শুনিতে পায়? কেবল তর্জ্জন আর গর্জ্জন খাইতে খাইতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। এখন তাহার নিজের সেই তর্জ্জন গর্জ্জন পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছে! বাড়ীর ভৃত্য হারাধন ঘোষ, আজ তিন পুরুষ এই সংসারে চাকুরী করিয়া আসিতেছে, এ চাকুরীর অন্য কোন সুখ থাকুক আর নাই থাকুক, হারাধনের আহারাদির বন্দোবস্ত ভালরূপ ছিল; কিন্তু হারাধনের এখন সে সুখও আর নাই। যে দিন ব্যঞ্জনাদি যথেষ্ট পায়, সেদিন তাহার অন্ন কম পড়ে, আবার যে দিন অন্ন যথেষ্ট পায়, সেদিন ব্যঞ্জনাদির অভাবে হারাধন উদর পুরিয়া সে অন্ন খাইতে পারে না। এখন হারাধন এই তিনপুরুষে চাকুরীর মায়া

পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। গৃহিণী, সকলকে মুখে তিরস্কার করুন আর যাহাই করুন, প্রত্যহ দুই বেলা সকলের আহারের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, এবং সকলকে ভালরূপ খাওয়াইতে বিশেষ আনন্দও উপভোগ করিতেন, সুতরাং তাঁহার সে তিরস্কার দাসদাসীর ততদূর কষ্টজনক ছিল না। এখন তিরস্কারের মাত্রা পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, অথচ তাহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। দাসদাসীরা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, সুতরাং আর তাহারা এ সংসারের সেরূপ শুভানুধ্যায়ীও রহিল না। আর এক কথা—সূর্য্যের উত্তাপ বরং সহ্য হয়, কিন্তু বালির উত্তাপ কখনই সহ্য করা যায় না। গৃহিণীর তিরস্কার বরং তাহারা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র বালিকা—যে আজ ৩।৪ বৎসর মাত্র এ সংসারে কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার তিরস্কার তাহারা কেন সহ্য করিবে?

আমরা তাই বলিতেছিলাম যে, পশুপতির সংসারে একটা মহাবিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছে। গৃহিণীর এখন আর কোন সাংসারিক কার্য্যে মন নাই। বিষহীন সর্প অথবা পঙ্কে নিমগ্ন হস্তী যেরূপ মনের দুঃখে নীরবে পড়িয়া থাকে, গৃহিণীও সেইরূপ মনের দুঃখে নীরবে পড়িয়া থাকিতেন। তবে যখন বড়ই অসহ্য বোধ হইত, তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সকল সময়ে মনের ভার গোপন রাখিতে পারিতেন না, পুত্র ও ছোট পুত্রবধূর গুণের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। সে সকল কথা আবার পুত্র ও ছোট পুত্রবধূর কানে গিয়া উঠিত। ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করায় জননীর প্রতি পুত্রের ক্রোধের সীমা থাকিত না; আর ছোট পুত্র-

বধূমাতার কেবল ক্রোধ নহে, ক্রোধের পশ্চাতে প্রতিহিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ প্রভৃতির ভীষণ মূর্ত্তি সকলও লুক্কায়িত থাকিত। তবে পুত্রের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ পাইত না ; কারণ, তিনি জননীর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বধূমাতার ক্রোধ যখন সদর্পে দেখা দিত, তখন গৃহিণীর ভর্ৎসনার আর বাকি থাকিত না।

কিন্তু এদিকে সংসারে যেরূপ বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছিল, তাহাতে পুত্র পশুপতি নিশ্চয়ই জননীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় সাংসারিক সমস্ত ভার দিতে বাধ্য হইতেন, যদি জননী পাড়ায় পাড়ায় তাঁহার নিন্দা না করিয়া একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুই জনেই ভুল বুঝিলেন। পুত্র বুঝিলেন, যখন জননী পাড়ায় পাড়ায় তাঁহার নিন্দা করিয়া আসিতেছেন, তখন সংসার উৎসন্ন গেলেও তিনি আর জননীর পদানত হইবেন না। আর জননী বুঝিলেন, যেরূপ গতিক দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর অন্য উপায় কি? তবে যদি লোক লজ্জার ভয়ে পুত্রের মনের কোন পরিবর্ত্তন হয়। জননী এই ভাবিয়াই পাড়ায় পাড়ায় পুত্রের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। ছোট পুত্রবধূ অপেক্ষা, পুত্রের উপরই তাঁহার ক্রোধই বল আর অভিমানই বল অধিক।

হায়! এইরূপ ভুলই অনেক সময় আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যদি এ সংসারে এরূপ ভুল না থাকিত, তবে এ সংসার স্বর্গ হইত। পুত্রের প্রতি জননীর কি স্নেহ নাই? জননীর প্রতি পুত্রের কি ভক্তি নাই? কিন্তু এই ভুল যখন আমাদের পবিত্র সংসারে প্রবেশ করে, তখন জননীর স্নেহ বা পুত্রের মাতৃভক্তি

পর্য্যন্ত কোথায় চাপা পড়িয়া যায়, আর এই সুখের সংসার তখন শ্মশানে পরিণত হয়। সংসার বড় বিষম স্থান, অতি সাবধানে চলিতে হয়, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। আরও দেখ—এ সংসার-খেলায় যদি একবার ভুলিলে, তবে কে আর তোমায় রক্ষা করে? গৃহিণীর প্রথম ভুল, ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেওয়া। এ ভুল আর কি গৃহিণী শোধরাইতে পারেন? সেই কারণ এ সংসারে গৃহিণীর দ্বারা আর কোন কাজ হইতে পারে না, এখন সকল কাজেই তাঁহার ভুল হইবে। পশুপতিরও ভুল দেখ, সংসারে যে একটা বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে, তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছেন, তথাপি তাহার প্রতিকার-চেষ্টা করিবেন না। জননীর উপর অভিমান করিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতেছেন। আর কোন প্রকার মনুষ্যত্ব প্রকাশ না করিয়া কেবল ঘটনা-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন!

তাই বলিতেছিলাম—খুব সাবধান! এ সংসার বড় বিষম স্থান—একবার ভুলিলে আর রক্ষা নাই! যে ভুলে স্বর্গ নরক হয়, উদ্যান শ্মশানে পরিণত হয়, সে ভুল কি সামান্য ভুল? তাই আবার বলি,—খুব সাবধান!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তবে কি পশুপতি, সাংসারিক গোলযোগ নিবারণের কোন চেষ্টাই করেন নাই? আমরা পশুপতির চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করিতে কখনই সাহস করি না। পশুপতির যে একটা হিসাব-বোধ আছে, তাহা তাঁহার এক শত টাকা বেতনে

সওদাগরী আফিসের চাকুরীতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। আর এ সংসারে আপনার ভালমন্দ কে না বুঝিতে পারে? তবে সে চেষ্টাটা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

পশুপতি একদিন সাংসারিক এরূপ বিভ্রাট দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া চারুশীলাকে বলিলেন,—"যে কাজ পারবে না, সে কাজে হাত দেও কেন?"

চারুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কাজটাই বা কি? আর পারিনাই বা কি?"

সেই ঈষৎ হাসিতেই পশুপতির অর্দ্ধেক বিরক্তিভাব কোথায় চলিয়া গেল। পশুপতি একটু নরম হইয়া বলিলেন,—"তুমিই তো ইচ্ছে করে, সংসারের ভার আপনি ঘাড়ে নিয়েছ; এখন চালাতে পার না কেন?"

চারুশীলা তখন পুনরায় সেই বৈদ্যুতিক হাসি ও কটাক্ষের সহিত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"কেন যে পারিনে, তা যদি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে, তাহলে আর তোমার অমন দশা হবে কেন?"

আবার সেই বৈদ্যুতিক হাসি! সঙ্গে সঙ্গে সকটাক্ষে আবার গ্রীবার সেই বক্রভাব! পশুপতি একবারে জল হইয়া গেলেন। চারুশীলা পুনরায় আরম্ভ করিল,—"আমায় কর্‌তে না দিলে আমি কি করে করবো? এত আমার সংসার নয়; এ হয়েছে আমার শত্রুপুরী! এ শত্রুপুরীতে কি কোন কাজ কর্‌বার যো আছে? সকলে একদিকে, আর আমি একলা একদিকে, আমি পেরে উঠ্‌বো কেন? এত সহ্য করি, তবু পাড়ায় পাড়ায় আমারই

নিন্দে! মরুক্ গে, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আমি আছি, আমারই নিন্দে হ'ক। কিন্তু তুমি তো কোন দোষে দোষী নও, তোমার নিন্দেতেও গ্রামে মুখ দেখান ভার! লোকের আক্কেল—"

বলিতে বলিতে, চারুশীলার সেই সহাস্য মুখচন্দ্র ক্রমে গম্ভীরভাব ধারণ করিল, কোথা হইতে হঠাৎ যেন এক ভীষণ রাহু আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রকৃতির নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? বৈদ্যুতিক হাসির সঙ্গে সঙ্গেই এক ভয়ঙ্কর মেঘ দেখা দিল। তাহার পরই বর্ষণ! ধীরে ধীরে মুক্তাফলের ন্যায় চারুশীলার নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু-জল!. পশুপতির মাথা ঘুরিয়া গেল।

পশুপতি উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"মা বড় নির্ব্বোধ, আমি এত চেষ্টা করেও কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌লেম না। কিন্তু কি কর্‌বো—তিনি মা।"

চারুশীলাও, তাড়াতাড়ি নয়নপ্রান্তের সেই অশ্রু বিন্দুটুকু মুছিয়া উন্মত্তভাবে বলিল,—"কেবল কি মা! মা তো নির্ব্বোধ, কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তাই হাউমাউ করে বেড়ান, তাঁর বুদ্ধিসুদ্ধি থাক্‌লে কি তিনি তোমার আর আমার পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করে বেড়ান? কিন্তু এর ভেতর অনেক বুদ্ধিমানও আছেন যে! তাঁরা বাহিরে দেখান বড় ভাল, ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেন না, কিন্তু পেটে পেটে আমায় পেলে পাঁশ পেড়ে কাটেন।"

পশুপতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কারা তারা?"

চারুশীলা নোলক নাড়িয়া বলিল,—"আবার কে? তোমার গুণের বড় স্ত্রী, আর তারই সোহাগের বিধুমুখী ঝি।"

পশুপতি এবার ক্রোধান্বিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কোন কথা মুখে আসিল না, পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"ঝিয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি কালই তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবো।"

চারুশীলা।—ঝিকে তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবে, ঘরের স্ত্রীকে তো আর ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দিতে পার্‌বে না?—তার উপায় কি কর্‌বে?

পশুপতি।—তাকেও শাসন কর্‌বো।

চারুশীলা।—সে মুরোদ তোমার নেই। মুরোদ থাক্‌লে আর তোমার এমন দশা হয়? তোমার কি কোন পুরুষত্ব আছে? সে আমার মেজদাদা। মেজ বউ একটু দোষ কর্‌লে, মেজদাদা তাকে ধরে মারে পর্য্যন্ত।

পশুপতি।—আমি জান্‌তাম তারার কোন দোষ নেই। সে তোমার খোসামোদ করেই চলে। কই, আমি তো তাকে কখনও তোমার বিপক্ষে কোন কাজ কর্‌তে দেখি নাই।

চারুশীলা।—তুমি দেখ্‌তে পাবে কেন? তোমায় যে সে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। বড় স্ত্রীর নাম কর্‌লে যে তোমার এখনও লাল পড়ে। তোমার বড় স্ত্রী যদি এত ভাল, তবে আমায় বিয়ে কর্‌লে কেন?

পশুপতি।—আমি সে ভাবে বলছি না। তুমি হঠাৎ রাগ কর কেন?

চারুশীলা।—তোমার ভাব বুঝ্‌তে আমার বাকি নেই। বুঝ্‌তে বুঝ্‌তে আমার হাড়মাস কালি হয়ে গেল।

এবার বিনা মেঘে একেবারেই বর্ষণ! মুষলধারে বর্ষণ! বিন্দুর পর বিন্দু হইতে না হইতেই, একেবারে অজস্র অশ্রু পতন! সঙ্গে সঙ্গে পশুপতিরও অবশ্যম্ভাবী পতন! সেই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতির সাংসারিক গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা ও হিসাব বোধেরও পতন! চারুশীলা, তুমি যথার্থই বলিয়াছ—পশুপতির কোন পুরুষত্ব নাই।

এখন পশুপতি যে একজন নিশ্চেষ্ট পুরুষ নয়, একথা যদি পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তবেই আমাদের এই পরিচ্ছেদ লেখার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তবে কি পশুপতির যথার্থই কোন পুরুষত্ব নাই? আমরা কেবল একথা বলিলে কিছুই ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যখন চারুশীলার শ্রীমুখ হইতে এ কথা বাহির হইয়াছে, তখন পশুপতি কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কথাটা পশুপতির বড় অসহ্য বোধ হইল। তিনি এবার আপনার পুরুষত্ব দেখাইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। পুরুষত্বের প্রথম চোট পড়িল, বিধুমুখী ঝির উপর। পশুপতি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমার খাস্, আমার পরিস্, আর আমারই অনিষ্ট করিস্।"

বাবুর মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া, প্রথমে বিধু কিছু ভীত

হইল, তাহার পর, বাবু যে ছোট বধূমাতার নিকট হইতে আসিয়াই তাহাকে এইরূপ তিরস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, এই কথা বিধুর মনে পড়িয়া গেল। তখন, ক্রোধের কারণ জানিতেও বিধুর আর বাকি রহিল না। বিধু সাহস করিয়া বলিল,—"কেন গা? আমি কি অনিষ্ট করেছি?"

বাবু বলিলেন,—"তোর্ বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।"

বিধু।—তা বেড়ে থাকে, বেড়েছে, তাতে তোমার অনিষ্ট কি করেছি?

বাবু।—তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! এখনি জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো জানিস্নি।

বিধু কি আর স্থির থাকিতে পারে? সেও মুখ ছুটাইয়া দিল—"কই মার না—জুতো মারার কত সুখ একবার দেখ না। আমার গতর সুখে থাক্, আমি তোমার মতন ঢের ঢের বাবু দেখেছি। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা মুখের কথা নয়!"

বিধুমুখী তাহার পর ক্রন্দনের সহিত আরম্ভ করিল,—"আমায় ডেকে এনে এই অপমানটা কর্লে গা? যিনি আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছেন; ভগবান তাঁর বিচার কর্বেন—তেরাত্তির পোয়াবে না—তেরাত্তির পোয়াবে না। আমি যদি—"

বিধুমুখী অঙ্গুলি মটকাইয়া শেষের কয়েকটি কথা উত্থাপন করিতেছিল, এমন সময় সে স্থলে স্বয়ং চারুশীলা আসিয়া দেখা দিল, তখন পশুপতিকে আর বড় কোন কথাই বলিতে হইল না। চারুশীলা সে স্থানে অধিকার করিয়া এমন কোন্দল আরম্ভ করিল, যে কোন্দলে সর্ব্বজয়ী বিধুমুখীকেও রণে ভঙ্গ দিয়া

পলায়ন করিতে হইল। কারণ এ সময় পলায়ন না করিলে বিধুকে প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হইত। এই ঘটনাতেই এ সংসার হইতে বিধুর অন্ন উঠিল।

পশুপতির দ্বিতীয় কার্য্য হইল—তারাসুন্দরীকে শাসন করা। তারা এ সংসারে এখন দাসীর ন্যায় থাকে। তারার দেহ এখন গুরুতর পরিশ্রমে, শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অযত্নে সে শীর্ণ দেহের অবস্থাও এখন অতি শোচনীয়। সেই তপ্তকাঞ্চনতুল্য বর্ণ, সদাই প্রফুল্ল মুখকমল, সেই সকরুণ দৃষ্টি প্রভৃতি—এ দেহের সকল নৈসর্গিক শোভাই এখন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার যে সৌন্দর্য্যগরিমা ঈর্ষানলদগ্ধা সুন্দরীগণের তীব্র সমালোচনারও অক্ষুণ্ণ ছিল, এখন মনোকষ্টে সে সৌন্দর্য্যও মলিন হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্য দূরের কথা, বোধ হয়, তারাসুন্দরীর জীবন প্রদীপও এখন যেন নির্ব্বাণোন্মুখ! আজ এই তারাসুন্দরীর উপর তাহার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী আপনার 'পুরুষত্ব' দেখাইতে উপস্থিত! পশুপতি এখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং তারাসুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং কর্কশ স্বরে বলিল,—"তোর্ জ্বালায় আমি অস্থির হয়েছি। তোর্ পতিভক্তির মুখে আগুন, আমি এখন তোর সব বদ্‌মায়েসি বুঝ্‌তে পেরেছি।"

কিন্তু পশুপতির এ কর্কশ স্বর, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার, তারাসুন্দরীর কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করিল। সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর সোহাগ ও আদর অপেক্ষা, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের মূল্য অধিক বোধ করে। সুতরাং তারাসুন্দরী আনন্দে গদগদস্বরে বলিল,— "তুমি এসেছ—এতদিন পরে আমার কাছে আবার এসেছ—

এস, কিন্তু অত চেঁচিয়ে কথা কও কেন? বক্‌তে হয়, চুপি চুপি বক, মার্‌তে হয়, চুপি চুপি মার, কেউ জানতে পারলে, তোমায় কি এখানে থাক্‌তে দেবে? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? একবার আমার কাছে বসনা।"

তারাসুন্দরীর আগ্রহের সহিত অতি ক্ষীণস্বরে এইরূপ অনুনয় বিনয়েও, পশুপতির হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পশুপতি পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় হৃদয়ে বলিলেন,—"আর তোমার ভালবাসা জানাতে হবে না।"

তারাসুন্দরী।—আমি তোমায় ভালবাসা আবার কি জানাব? তবে যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকি, আমায় বুঝিয়ে দেও—আমায় শিখিয়ে দেও, তুমি না বুঝালে—তুমি না শেখালে, আমায় আর কে শেখাবে?

পশুপতি।—আমি তোকে কি শেখাব? তুই কি আর সে তারা আছিস্?

তারাসুন্দরী।—আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমার প্রতি কে তোমার মন এমন্ করে দিলে?

পশুপতি।—কে বলে, তোর মনে হিংসে নেই? তোর প্রতি কথায় হিংসে ফুটে বেরুচ্ছে। এই হিংসে করেই তুই সর্ব্বনাশ কর্‌ছিস্।

তারাসুন্দরী।—তুমি স্বামী—দেবতা—অন্তর্য্যামী। তোমার কাছে কেন কোন কথা গোপন কর্‌বো? আমি অন্য কিছুরই হিংসে করি না, কেবল তোমার ভালবাসার হিংসে করি। তুমি [illegible]ল দাও, তুমি শিক্ষা দাও, আমার মন থেকে এ হিংসাকে তুমি [illegible]ড়িয়ে দাও। তুমি মনে কর্‌লে সব কর্‌তে পার।

পশুপতি।—তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি এমন ধারা হিংসে আর কর না।

তারাসুন্দরী।—আমি চেষ্টা কর্‌বো। আমি অতি দুর্ব্বল, তুমি আমার বল, তুমি বল না দিলে আমি কি কর্‌তে পারি?

পশুপতি।—তোমার ও সব ছেঁদো কথা ঢের শোনা আছে। এখন যা বলি, তাই শোন, নইলে তোমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে।

এই কথা বলিয়া, পশুপতি সে স্থান হইতে দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বিস্মিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া, পুনরায় গৃহকার্য্যে মন দিল। পৃথিবী, তোমার কত সহ্যগুণ আছে? তারার সহ্যগুণ তোমায় পরাস্ত করিয়াছে!

পশুপতির তৃতীয় কার্য্য হইল—জননীকে শাসন করা। পশুপতি জননীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি এতদিন তোমায় কোন কথা বলি নাই, কিন্তু তুমি যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ, তাতে আর না বলে থাক্‌তে পার্‌লেম না। তুমি মা বলে আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না।"

জননী তো অবাক! অনেক দিনের পর আজ তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। তিনি কি উত্তর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পুত্র পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"তুমি কেবল আমার অমঙ্গলের চেষ্টায় আছ। আমার মান, সম্ভ্রম, সংসার, ধর্ম্ম, তোমা হতেই সব গেল।"

জননী এইবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুত্রের মুখে এরূপ

কথা শুনিয়া, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? কিন্তু পুত্র, জননীর মনের অবস্থা বুঝিল না, জননীও পুত্রকে সে কথা কিছুই জানাইতে পারিলেন না। পুত্র অনেক কথা বলিল, জননীও অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। শেষ ফল এই দাঁড়াইল যে, পুত্রের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, জননীর পূর্ব্বস্নেহ কিছুমাত্র আর তাঁহার প্রতি নাই, আর জননীরও দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, পুত্রের পূর্ব্ব মাতৃভক্তি কিছুমাত্র আর তাঁহার প্রতি নাই!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এইবার পশুপতি জননীর গুণের কথা ক্রমে ভুলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার মনে জননীর দোষের কথা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তারাসুন্দরীর কথা আর আমরা কি বলিব? পশুপতি ইহার পূর্ব্বেই সে প্রেমপ্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে 'কাটামটা' মাত্র আছে, এবার তাহারও বুঝি বা বিসর্জ্জন হয়।

পশুপতির সাংসারিক অবস্থার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্রমে সে অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পশুপতি ক্রমে তাহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। এস্থলে আর এক কথা আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পশুপতির অবস্থা যত মন্দ হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারুশীলার পিতার অবস্থা ক্রমে তত ভাল হইতে লাগিল। এই দুই অবস্থার সহিত কোনরূপ নিকট সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের 'বিবী পিসিকে'

গোপনে জিজ্ঞাসা করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা জানি, এ কথাটা পশুপতির মনে একবারও উদয় হয় নাই।

পশুপতি এতদিন জননী ও তারাসুন্দরীর উপর বিরক্ত হইয়া ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, পশুপতি আর এরূপভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তথন একটা উপায় স্থির করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। অন্য উপায় আর কি করিবে? এরূপ অবস্থায় মানুষের সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, পশুপতিরও তাহাই হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পশুপতি পুনরায় চারুশীলারই শরণাগত হইল। চারুকে ডাকিয়া এবার মিনতি করিয়া বলিল,—"চারু, সংসারে যেরূপ খরচপত্রের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়েছে, এতে আমি তো আর পেরে উঠি না, তুমি এর একটা উপায় কর।"

চারুশীলা তখন, স্বামীর বিষণ্ণ মুখের সম্মুখে আপনার প্রফুল্ল মুখ নাড়িয়া, সেই সর্ব্বনেশে হাসি হাসিয়া বলিল,—"সংসারের খরচ ক্রমে কমে, না বাড়ে? তুমি আয় বাড়াবার চেষ্টা করনা।"

পশুপতি।—আয় বাড়ান তো আর ইচ্ছে করলেই হবে না?

চারুশীলা।—কেন, সাহেবকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে বল না?

পশুপতি।—এখন আফিসের যেরূপ গতিক, তাহাতে মাইনে বাড়িয়ে দিতে বল্লেই চাকুরীটুকু পর্য্যন্ত যাবে।

চারুশীলা।—তবে অন্য চাকুরীর চেষ্টা কর। এখন

তোমার খরচ ক্রমেই বাড়্‌তে চল্‌লো। আবার একটা খরচ বাড়্‌বার—না বলবো না।

ঈষৎ হাসিয়া সলজ্জভাবে চারুশীলা সেই আরাক্তিম মুখকমল নত করিল। পশুপতি আগ্রহের সহিত বলিল,—"কি কথা—বল্‌তে বল্‌তে আবার চেপে গেলে যে।"

চারুশীলা নীরব হইয়া সেই ভাবেই রহিল, পশুপতি অধিক-তর আগ্রহের সহিত পুনরায় বলিল,—"আমায় বল্‌তে লজ্জা কি? কি হয়েছে বল না?"

একটা বিষয়ে পশুপতির মনেও কিছু সন্দেহ হইয়াছিল, পত্নীর মুখে কথাটা স্পষ্ট শুনিবার জন্য পশুপতি তখন অধীর হইয়া পড়িলেন। চারুশীলা লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া ক্রমে পশুপতির ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। শেষে অনেক অনুরোধের পর চারুশীলা পশুপতির ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়াই বলিল,—"আমি তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা।"

পশুপতি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। পশুপতি সে আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, পত্নীকে সজোরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। অনেকক্ষণ পশুপতির আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না, যখন জ্ঞান হইল, তখন পশুপতি চাহিয়া দেখে যে, চারু-শীলার মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

পশুপতির চারু এত সুন্দর! তাহার এত গুণ! একাধারে এ রূপ ও এত গুণ কিরূপে হইল, পশুপতি বিধাতার সৃষ্টির এ অপূর্ব্ব কৌশল বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে পশুপতি সংসার ভুলিল, সংসারের জ্বালা, জননীর জ্বালা, তারা-

সুন্দরীর জ্বালা, দেনার জ্বালা প্রভৃতি সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া গেল। পশুপতির হৃদয় তখন নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইল।

আনন্দের বেগ কিছু হ্রাস হইলে, পশুপতি বলিল,—"তোমাকে এখন বিশেষ সাবধানে থাক্‌তে হবে, সংসারের গুরুতর পরিশ্রম এখন আর তোমার সহ্য হবে না। তবে এখন সংসার কিরূপে চল্‌বে, আমি তাই ভাব্‌ছি।"

চারুশীলা বলিল,—"তোমার সে বিষয় আর ভাবতে হবে না, আমি তার একটা উপায় স্থির করেছি।"

পশুপতি।—সে উপায় কি?

চারুশীলা।—দেখ, আমার তো শত্রুপুরীতে বাস। আপ্‌নার লোক এক তুমি বই, এ সংসারে আমার আর কেউ নাই। এখন একজন আপ্‌নার লোকের বড় দরকার। আমি বলি, বিন্দী পিসিকে এখন আমাদের সংসারে আনি। পিসিমা আমাদের যেরূপ ভালবাসেন, তাতে এ কথায় তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।

এখন চারুশীলার কথার কোন প্রতিবাদ করিবার পশুপতির আর কি কোন ক্ষমতা আছে? পশুপতি কোনরূপ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া আহ্লাদের সহিত সে কথায় সম্মত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বলিল,—"এ পরামর্শ ভালই হয়েছে। পিসিমা তোমাকেও যত্ন করবেন, আর তিনিও একজন পাকা গৃহিণী। মার তো কোন বুদ্ধি নাই, তাঁর বেশ বুদ্ধি আছে—সংসারের ভার তাঁর উপর দিলে, তুমি কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পার। এখন তিনি রাজী হলেই হয়।"

চারুশীলা।—সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই তাঁকে

রাজী করার ভার আমার রইলো। আর এক কথা বলি—আমার ছেলে হবে, এই হিংসের অনেকে এখন আমার মন্দ চেষ্টা পাবে। আমি ছেলে মানুষ, কি বুঝি? পিসিমা থাক্‌লে, আমি সে বিষয়েও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বো।

এ কথা শুনিয়া পশুপতি যেন উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"তোমার মন্দ চেষ্টা যিনি পাবেন, হাতে হাতে প্রতিফলও তিনি পাবেন। তিনি যিনিই হউন না কেন, মা হলেও আমি তাঁকে ক্ষমা কর্‌বো না।"

পশুপতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চারুশীলার হৃদয়ে একটা আনন্দের লহরী উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে চারুশীলার অনুরোধ রক্ষা হইল, বিশেশ্বরী আসিয়া পশুপতির সংসারের অধিশ্বরী হইলেন। এ ঘটনায় পশুপতির জননীর হৃদয়ে যেন একটা তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইল, তখন তিনি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিশেশ্বরীর সহিত পশুপতি-জননীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল; এই ঘটনায় সে সদ্ভাব আর রহিল না। বিশেশ্বরী 'বরের ঘরের মাসি আর কনের ঘরের পিসি' সাজিয়া সে সদ্ভাব রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট-বশতঃ কোন ক্রমেই সে সদ্ভাব আর রক্ষা হইল না। আপনার পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্ব বরং সহ্য হয়, কিন্তু একজন পর আসিয়া যে তাঁহার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবে, গৃহিণীর কি তাহা সহ্য হইতে পারে?

আর এক কথা আমরা বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি। পুলিন-বধূর অন্তঃসত্ত্বার সংবাদ শুনিয়া পশুপতি-জননী কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। যে পশুপতি-জননী পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য পাগলিনী হইয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই পশুপতি-জননী পুত্রবধূকে পুত্রসম্ভবা জানিয়াও কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন না কেন? আমাদের বোধ হয়, পশুপতি-জননী এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই পৌত্র মুখ-দর্শন-লালসাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল—এই পৌত্র-মুখ-দর্শনের উপায় করিতে গিয়াই তিনি তাঁহার সোণার সংসারকে শ্মশান করিয়াছেন। এ কথা যদি তিনি এত শীঘ্র বুঝিয়া থাকেন, তবে আমাদের আশা আছে যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার জীবনের ভুল সংশোধন করিয়া উঠিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা সকল আলোচনা করিলে, আবার আমাদের এই অনুমানের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ হয়। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, পশুপতি-জননীর চরিত্রের এই অংশ আমরা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই সে রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দেবতারাই স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবে আমরা সামান্য মনুষ্য হইয়া কিরূপে বুঝিব? বিশেষতঃ এই গৃহিণী-স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন ব্যাপার।

এই সময় তারাসুন্দরীর বিষয় দুই এক কথা বলিলে, বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণ বিরক্ত হইবেন না। তারা এ সংবাদে কিন্তু বড়ই আনন্দিত হইয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, তারা সতিনীকে পুত্রসম্ভবা জানিয়া, আনন্দে এতদূর অধীরা

হইল যে, অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, চারুশীলার নিকট আসিয়া বলিল,—"চারু, একটা শুভ খবর শুনে, আমি তোমার কাছে দৌড়িয়ে এসেছি; তুমি এতদিন সে খপর আমায় বল নাই কেন বোন?"

চারুর মুখ গম্ভীর হইল। হঠাৎ একটা দুর্ভাবনা মনে উদয় হইলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, চারুর মনের অবস্থা এখন সেইরূপ। তাহার উত্তরে সে ভাব প্রকাশ হইল কি না জানি না; কিন্তু তাহার মুখভঙ্গিমার ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিলে, সে মনের ভাব কতক প্রকাশ পাইত। চারু বলিল,—"কি শুভ খবর আবার তোমার কাছে গোপন করেছি—তাই তুমি আমার কাছে কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্‌তে এসেছ?"

তারাসুন্দরী।—ঝগড়া কর্‌বো কেন বোন? তুমি ছোট বোন, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, যেন তোমার একটী পুত্র-সন্তান হয়।

চারুশীলা।—যদি আমার অদেষ্টে ছেলে থাকে, তবে তুমি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেও হবে, আর হিংসা কর্‌লেও হবে।

তারাসুন্দরী।—হিংসে কর্‌বো কেন বোন? তোমার ছেলে হলে, আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষা হবে। তোমার ছেলেতে আর আমার ছেলেতে কি কোন প্রভেদ আছে?

চারুশীলা।—না—প্রভেদ আর কি আছে? তবে আমার ছেলে হলেই তোমার বকে বজ্রাঘাত পড়বে—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

কথাটা শুনিয়া তারার আনন্দের তরঙ্গের বেগ যেন একটা প্রবল বাধা পাইয়া কতকটা থামিয়া গেল। তখন একটু

বিস্মিত হইয়া তারাসুন্দরী বলিল,—"চারু, তোর এই কথা-টাতে আমার বুকে বাস্তবিকই বজ্রাঘাত হয়েছে। আমি কখন মনেও কখন তোর অনিষ্ট করিনি, তবে আমার অদৃষ্ট মন্দ বলেই তুই আমায় মন্দ ভাবিস্।"

চারুশীলা হাজার মন্দ হউক, তথাপি আমরা সত্যের অনুরোধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, চারুশীলা বিশ্বেশ্বরীর ন্যায় মনের ভাব গোপন করিতে কখন শিক্ষা করে নাই। সেই কারণ বিশ্বেশ্বরীর কথার ন্যায় চারুশীলার কথায় কোনরূপ মধুরতা আমরা দেখিতে পাই না। বিশ্বেশ্বরী যাহা উদ্গীরণ করে, তাহা বিষ বটে, কিন্তু আস্বাদ মধুর ন্যায়, কিন্তু চারুশীলার উদ্গারিত বিষের আস্বাদ অতি তিক্ত। এ সংসারে মধুর আস্বাদের বিষ ভাল, কি তিক্ত আস্বাদের বিষ ভাল, তাহার কোন বিচার এস্থলে না করিয়া, আমরা এখন আমাদের অবলম্বিত পথেই চলিব। তারাসুন্দরীর কথায় চারুশীলা তাহার সেই বিরক্তিভাবপূর্ণ মুখখানি লুকাইয়া বলিল,—"তুমি অদেষ্ট অদেষ্ট করোনা বলছি। ওঁর অদেষ্ট মন্দ, আর আমার অদেষ্ট ভাল"! কথার শ্রী দেখছ! আবার বলেন কিনা, হিংসে কাকে বলে জানিনে।"

তারাসুন্দরীর মুখে আর কথা নাই। তারা আর কি করিবে? একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অধোমুখে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। তারা চলিয়া গেলে, বিশ্বেশ্বরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বেশ্বরীকে দেখিয়া চারুশীলা বলিল—"পিসিমা, বুড়ো মাগীর আক্কেল দে'খ? আমার ছেলে হবে শুনে, একেবারে হিংসেয় মরে গেল। আমার অদেষ্ট

ভাল, আর তাঁর অদেষ্ট মন্দ, এমনিধারা কত হিংসের কথা যে বল্লে, তা পিসিমা, তোমায় আর আমি কি বল্‌বো?"

বিশ্বেশ্বরী অমনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"বলিস্ কি! তোর মুখের উপর একথা বল্‌লে!"

চারুশীলা।—তা নয় ত কি? এখন যে আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী।—খুব সাবধান মা—খুব সাবধান! আমার ত মা, রাত্রে ঘুম হয় না। এই শত্রুপুরীর মাঝখানে কি করে যে তোর পেটের ছেলে রক্ষা কর্‌বো, আমি তা কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না।

চারুশীলা।—তুমি ভেবে স্থির কর্‌তে না পার্‌লে, পিসিমা, আমার উপায় কি হবে?

বিশ্বেশ্বরী।—তোমার উপায় ভগবান কর্‌বেন মা, তুমি ত আর কারু মন্দকারী নও? আহা! আমার দাদার বংশ রক্ষা হবে, এতেও পোড়া লোকে হিংসে করে গা!

চারুশীলা।—আবার এমন শাশুড়ীও কোথাও দেখিনি। একবার উঁকি মেরেও দেখেন না। কেবল পাড়ায় পাড়ায় আমাদের নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন।

বিশ্বেশ্বরী।—তোমার শাশুড়ীকে আমি ভাল বলে জান্‌তুম, কিন্তু এখন তাঁর ব্যবহার দেখে আমি অবাক্ হয়েছি মা। আমি ত কারু ভালতেও নেই, কারু মন্দতেও নেই—আমার ওপরেও রাগ! এই দেখ না, যে থেকে আমি এ সংসারে এসেছি, সেই থেকে আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত ভাল করে আর কথা কয় না। আমি তাঁর এত খোসামোদ করে মরি, তবু যেন আমার ওপর রাগ রাগ।

চারুশীলা।—তাঁর রাগে কি এসে যাবে? এখন আর আমি তাঁর রাগে ভয় করি না।

বিশ্বেশ্বরী।—হাঁ, তোমায় মা, একটা কথা শিখিয়ে দি! আমার সুমুখে যাকে যা ইচ্ছে বলো, কিন্তু অন্য লোকের সুমুখে শাশুড়ীকে ক্যাঁট্‌ ক্যাঁট্‌ করে কোন কথা বলো না। লোকের সুমুখে খুব ভালমানুষী দেখাবে, আর আড়ালে যা মনে আসে, তাই করবে। তুমি ছেলে মানুষ, সংসারের কি জান মা, তাই তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।

চারুশীলা।—আমি মনে করি, তাই করবো, কিন্তু পারি না। এরা আমায় যে জ্বালাতন করে, তাই তো আমার শরীরের ঠিক থাকে না।

বিশ্বেশ্বরী।—আহা! তা বৈ কি মা। তুই সে দিনের মেয়ে, তুই এ সব জ্বালা সইতে পারবি কেন?

এই কথা বলিয়া, বিশ্বেশ্বরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। চারুশীলা মনে মনে বলিল,—"বিষী পিসির মতন আমার আপনার লোক এ সংসারে আর কে আছে?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এদিকে তারাসুন্দরীর এক উৎকট রোগ দাঁড়াইয়াছে। প্রথম প্রথম প্রতি রাত্রে তারার অল্প অল্প জ্বর হইত, আর প্রতিদিন প্রাতে স্নানাদি করিয়া তারাকেই সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ও রন্ধনাদি করিতে হইত। বিধুমুখী বিদায় হইয়াছে; গৃহিণী এখন গৃহকার্য্য করা দূরে থাকুক, গৃহেই থাকেন না, সুতরাং

তারাসুন্দরীকে এখন সংসারে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় গুরুতর পরিশ্রমের যাহা ফল, তাহাই হইল—তাহার জ্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তারা শয্যাশায়ী হইল—শেষে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, শয্যা হইতে উঠিতেও তাহার ক্ষমতা রহিল না। সুতরাং সংসারে তখন আবার একটা বিভ্রাট পড়িয়া গেল। এখন, সংসারের কাজকর্ম্ম করে কে? বিশ্বেশ্বরী এ সংসারের গৃহিণী হইয়াছে বটে, কিন্তু কোনরূপ পরিশ্রম করা তাহার কোনকালেই অভ্যাস ছিল না। আর, চারুশীলা এখন আসন্নপ্রসবা; সুতরাং তাহার সেবা করিতেই বিশ্বেশ্বরীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। এই বিভ্রাটে পশুপতিকে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেও হইয়াছিল।

তারাসুন্দরী ত শয্যাগত, কিন্তু গ্রামে একটা জনরব রটিয়াছে যে, তারাসুন্দরী সতিনীর সন্তান হইবার হিংসায় একেবারে ধরাশায়ী হইয়াছে। এ জনরবের জন্মদাতা সেই বিশ্বেশ্বরী। ঘটনাটা অবিশ্বাস-যোগ্যও নয়, সুতরাং সকলেই এ কথা বিশ্বাস করিল, তবে কেহ বা অন্যের মুখে শুনিয়াই বিশ্বাস করিল, কেহ বা পশুপতির গৃহে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া সে কথা বিশ্বাস করিল। যাহারা তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা তারাসুন্দরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার নিকট বসিয়া অনেক হা হুতাশ করিল, তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া তারাসুন্দরীকে দুই একটি সৎপরামর্শ দিয়া চলিয়া গেল। তারাসুন্দরী নীরবে তাহাদের সকল কথা শুনিল, এবং নীরবে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে আপনার চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। হতভাগিনীর হৃদয়ের কথা কেহ বুঝিল

না, এবং তাহার সে সময় সে কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতাও ছিল না। সুতরাং তাহার সেই অশ্রুজল—সেই মর্ম্ম-ভেদী অশ্রুজলের মর্ম্ম কে বুঝিবে? হায়! এ সংসারে এরূপ কত অশ্রুরই পতন হইয়া থাকে!

আজ তারাসুন্দরী পিতা রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তারাসুন্দরীর পীড়ার অবস্থা এখন আবার ভয়ানক হইয়াছে। কেবল জ্বর নয়, সেই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও মুখে রক্তউঠা দেখা দিয়াছে। সেই কারণ, এখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিষণ্নমনে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছেন। পশুপতির জননীও আজ বিশেষ উদ্বিগ্না। এতদিন সেই জনরবে বিশ্বাস করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন বড়-বধূমাতার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া তিনিও ব্যাকুল হইয়াছেন। অনেক ক্ষণের পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কি চিকিৎসা হচ্ছে?"

রোগী ব্যতীত দুই জন মাত্র তখন সে গৃহে ছিলেন; সুতরাং পশুপতির জননী উত্তর করিলেন,—"চিকিৎসা আর কি হবে বেই? এখন কি আমার সে সোণার সংসার আর আছে? কোথা থেকে একটা ছোটলোকের মেয়ে এসে, আমার সোণার সংসারকে ছারখার করে দিয়েছে; আমি ত আর সংসারের কিছু দেখিনে, ছেলে আমার বড়-বউমার নামে জ্বলে যায়, আবাগী নিশ্চয় তাকে, 'গুণ' করেছে;—তবে কে আর চিকিৎসা করাবে তা বল?"

ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এমন উৎকট রোগ, আর চিকিৎসা হয় নাই?"

পশুপতি-জননী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—"আপনি যদি বউমাকে বাঁচাতে চান, তবে শীগ্‌গীর এখান থেকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান-গে।"

ব্রাহ্মণও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তাই হবে, আমি আজই নিয়ে যাব।"

এই সময় অতি ক্ষীণস্বরে তারাসুন্দরী বলিল,—"কাকে নিয়ে যাবে, বাবা?"

রামকমল চখের জল মুছিয়া বলিলেন,—"তোমায় নিয়ে যাব মা।"

তারাসুন্দরী।—না বাবা, আমি যাব না।

রামকমল।—কেন মা?

তারাসুন্দরী।—বাবা, আমি এতদিন মরে যেতুম, কেবল তোমাদের দেখবার জন্য প্রাণটা রয়েচে। এখন তোমায় দেখেছি—একবার সন্তোষকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, তারে একবার পাঠিয়ে দিও। আর একজনকে মর্‌বার সময় দেখ্‌বার বড় সাধ, যদি এখন পার ত তার কোন উপায়—

তারার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কিন্তু রামকমল সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, অশ্রুজলে তারার গাত্র-বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। অন্য একজন যে কে, তাহা তাঁহার জানিবার তখন আর বাকি রহিল না। ব্রাহ্মণ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"মা, তুমি সে পাষণ্ডের নাম আর আমার সুমুখে মুখে এনো না। যে তোমার মতন সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর এরূপ অবস্থা করেছে, সে তোমার স্বামী নয়—সে চণ্ডাল।"

পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা রোগীও

উত্তেজিতা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা—বাবা—আমার কাছে অমন কথা মুখে এনো না। আমি তোমার মুখেই অনেকবার শুনেছি, স্ত্রীলোকের স্বামীর মতন গুরু এ পৃথিবীতে আর নাই। তাঁর দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

রামকমল কন্যাকে এরূপ অবস্থায় উত্তেজিত হইতে দেখিয়া, ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা, স্ত্রীলোকের স্বামীর ন্যায় গুরু নাই সত্য, কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, সে স্বামী নামের অযোগ্য। যাক সে কথা—আমি এ অবস্থায় তোমায় কোন মনোকষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমার গৃহে চল। বেহান ঠাকরুণ যখন অনুমতি করছেন, তখন আজই তোমায় আমি ঘরে নিয়ে যাব।"

তারাসুন্দরী।—না বাবা, আমি এখন সেখানে যাব না।

রামকমল।—না গেলে তোমার জীবন রক্ষা হবে কি করে?

তারাসুন্দরী।—এ জীবনে আর কাজ কি বাবা? পতি যার প্রতি বাম, তার আর জীবনে দরকার কি বাবা?

ব্রাহ্মণ সজলনয়নে তৎক্ষণাৎ একবার কন্যার প্রতি চাহিলেন। কন্যার মুখের সেই উদাসভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি পুনরায় চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন,—"মা, এখানে থাকলে তোমার চিকিৎসা হবে না। যদি মৃত্যুই—"

ব্রাহ্মণ আর বলিতে পারিলেন না। সে সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারাসুন্দরীর আজ আর পিতার সম্মুখে কোন কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে না। সম্মুখে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইলে, লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকের লজ্জাও থাকে না।

তারা পুনরায় আরম্ভ করিল—"মৃত্যুর সময়ও কি একবার দেখা হবে না, বাবা? আমি সেই আশায় এখনও প্রাণ ধরে রয়েছি—সেই আশাতেই এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করি না।"

এই সময় পশুপতি জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, আমিই তোমার সর্ব্বনাশের মূল। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমায় অযত্ন করে আমি হাতে হাতে ফল পেয়েছি। তুমি ভাল হও মা, আমি তোমার গুণ এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি—আর তোমাকে কখনও কোন মন্দ কথা বলবো না।"

ধীরে ধীরে বীণাবিনিন্দিত স্বরে তারাসুন্দরী বলিল—"কেন তুমি সে সকল কথা মনে করে কষ্ট পাও মা? কে বল্লে তুমি আমায় অযত্ন করেছ—কে বলে তুমি আমায় মন্দ কথা বলেছ? তোমার মতন গুণের শাশুড়ী কয় জনের অদৃষ্টে ঘটে? আমি তোমায় পেয়ে মাকে ভুলে গিয়েছি। তবে কষ্ট এই যে, তোমায় আমি সুখী কর্‌তে পার্‌লেম না।"

শাশুড়ী তখন, একটু সুস্থির হইয়া বলিল,—"এখনও তুমি মনে কর্‌লেই মা, আমি সুখী হতে পারি। চল তোমার বাপের বাড়ী যাই, আমি শুদ্ধ সেখানে যাই। আর আমার মান-অপমানের ভয় কি? তোমায় যদি বাঁচাতে পারি, তবে আমি আবার সুখী হব।"

তারাসুন্দরীর চক্ষে আনন্দের জ্যোতিঃ দেখা দিল। তারা তৎক্ষণাৎ বলিল,—"তুমি সুখী হবে—তুমি সুখী হবে মা? তবে যাই চল, কিন্তু যাবার সময় কি একবার দেখা হবে না? যদি আর দেখা না হয়—যদি দেখা না হয়।"

ধীরে ধীরে ধীরে কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে, তারাসুন্দরী

চক্ষু মুদিল! কিন্তু সেই মুদিত পল্লব অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিল না, অবিশ্রান্ত অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সে দৃশ্য রামকমলের অসহ্য বোধ হইল, তিনি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রামকমল একবারে অন্দর-বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পশুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পশুপতি শ্বশুর মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রামকমল সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এ সকল শিষ্টাচার এখন থাক্; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ সংবাদ আমাকে এতদিন দেওয়া হয় নাই কেন?"

রামকমলের হঠাৎ এরূপ রাগতভাব দেখিয়া, পশুপতি যেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কি সংবাদ মহাশয়?"

রামকমল।—পীড়ার সংবাদ।

পশুপতি। কার পীড়া হয়েছে মহাশয়?

রামকমল। কেন আমার কন্যার যে পীড়া হয়েছে, সে সংবাদ কি তুমি কিছু জান না?

পশুপতি।—আমি তো তার কিছুই জানি না।

রামকমল।—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার স্ত্রী তোমারই বাড়ীতে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়ে রয়েছে, আর তুমি এ সংবাদ কিছুই জান না।

পশুপতি।—কই ?—আমি তো সে কথা শুনিনি!

রামকমল।—তোমার সে কথা শোন্‌বার আবশ্যকই বা কি ? এখন আমার কন্যা যে অবস্থায় এ সংসারে আছে, তাতে সে কথা তোমার না শোন্‌বারই কথা।

পশুপতি।—আমি শুনেছিলাম, আমার ছোট স্ত্রী পুত্র-সম্ভবা বলে, আপনার কন্যা হিংসায় একবারে ধরাশায়ী হয়েছে।

রামকমল।—তা ভালই শুনেছ। তারপর প্রকৃত ঘটনাটা যে কি, তা নিজে একবার তদারক করে দেখা কি তোমার উচিত ছিল না বাপু?

পশুপতি।—যে কথা শুনেছিলাম, তাতে আর তদারক করে কি দেখ্‌বো ?

রামকমল।—তুমি উত্তম কাজই করেছ—আমি সেজন্য তোমার কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না। এখন আমি আমার কন্যাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি; এখানে থাক্‌লে আমার কন্যার কখনই জীবন রক্ষা হবে না।

পশুপতি।—আপনি নিয়ে যেতে ইচ্ছা কর্‌লে সচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন। তবে আপ্‌নি যে আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন, এইটিই দুঃখের বিষয়।

রামকমল এইবার অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "গৃহস্থের বাড়ীতে একটা দাসদাসী কি একটা কুকুর বেড়ালেরও এরূপ সাংঘাতিক পীড়া হলে, তার চিকিৎসা করান উচিত, আর তোমার স্ত্রী এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় মরণাপন্ন, তবু তুমি তার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই কর নাই; এতে তোমার উপর বিরক্ত হয়েছি বলে, তুমি আমার দুঃখিত হয়েছ।"

পশুপতি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"আমি না থাকলে কিরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবো ?"

রামকমল পূর্ব্বের ন্যায় রাগাম্বিতস্বরেই বলিলেন,—"একজনের মুখে একটামিথ্যাকথা শুনে বিশ্বাস করাই কি তোমার উচিত হয়েছে ?"

পশুপতি এবার যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আজ্ঞে, একজনের মুখে নয়, অনেকের মুখে সে কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছিল।"

রামকমল এবার একটু স্থির হইয়া বলিলেন,—"যাক্ সে কথা। আর একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে যাচ্ছি। তুমি জান, আমার বাড়ীতে তেমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক নাই, একজন সেরূপ স্ত্রীলোক না থাক্‌লে স্ত্রীলোকের সেবা হওয়া বড় কঠিন। তোমার মা-ঠাকুরুণ আমাদের সঙ্গে যেতে চান, এতে তোমার মত কি ?"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"মা যদি যেতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার এতে আপত্তি কি ?"

"তবে আজই আমি কল্‌কেতায় নিয়ে যাব।"—এই কথা বলিয়া রামকমল পুনরায় অন্দরে আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রামকমল চলিয়া গেলে পর, পশুপতি অনেকক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর বিষণ্ণমনে তিনিও অন্দরে আসিলেন। অন্দরে প্রবেশ করিয়া তিনি বরাবর তারাসুন্দরীর গৃহের দিকেই যাইতেছিলেন, কিন্তু গৃহের সন্নিকটে গিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিতে আর তাঁহার সাহস হইল না। তখন

ধীরে ধীরে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি চারুশীলার গৃহে প্রবেশ করিলেন। চারুশীলা স্বামীর বিষণ্ণমুখ দেখিয়া আগ্রহের সহিত বলিল,—"তোমার মুখ অত শুকিয়ে গেছে কেন ?"।

পশুপতি প্রথমে সে প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না। চারুশীলা পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল। তখন পশুপতি এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন,—"শ্বশুর মহাশয় যে বড়-বউকে নিতে এসেছেন, শুনেছ ?"

চারুশীলা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"তা তো শুনেছি, তাতে আর ভাবনার বিষয় কি ? পিসিমা বল্‌ছিলেন—যদি কোন ভাল-মন্দ হয়, তবে এখানে না হয়ে বাপের বাড়ীতে গিয়ে হওয়াই ভাল।"

পশুপতি তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তবে কি বড়-বউয়ের ব্যারাম যথার্থই সাংঘাতিক ?"

চারুশীলা তখন একটু অন্যমনস্ক-ভাবে বলিল,—"এখন তো শুন্‌ছি, এযাত্রা আর রক্ষা পাবে না।"

পশুপতি কিছুক্ষণ চারুশীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওকে কে বড়-বউ তোমার ছেলে হবার হিংসের একবারে মরাপারী হয়েছে—সে কি মিথ্যা কথা ?"

এইবার চারুশীলা বাহ্য ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া কহিল —"সে কথা যে মিথ্যে—এ কথা তোমায় কে বল্লে ? প্রথমে তো সেইজন্যই মরাপারী হয়েছিল; তার পর ভগবান আছেন কি না—পিসিমা বলেন—পরের মন্দ চেষ্টা কর্‌লে আপনার মন্দ আগে হয়, তাই ভগবান সুবিচার করেছেন। শুনেথেকে

থেকে এমন রোগে হয়েছে যে, এখন আর বাঁচবার উপায় নেই।"

চারুশীলার এ কথায় শুরুত্ব পশুপতির তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম হইল। একটা আত্মগ্লানির ভার তৎক্ষণাৎ হৃদয় হইতে যেন সরিয়া গেল। এখন তাঁহার মন পুনরায় প্রফুল্ল হইল। তবে কি আমরা এতক্ষণ ভুল বুঝিয়েছিলাম! তারাসুন্দরীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে পশুপতির বিষণ্ণভাব দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, তারাসুন্দরীর পীড়ার সংবাদই বুঝি পশুপতির এ বিষণ্ণভাবের কারণ! এখন বুঝিতেছি, পশুপতির বিষণ্ণভাবের কারণ অন্যরূপ। যদি পশুপতির অযত্নে তারাসুন্দরী এরূপ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, তবে বাস্তবিক এ চিন্তা পশুপতির হৃদয়কে সন্তাপিত করিতে পারে, আর যদি তারাসুন্দরীর নিজের দোষই তাহার এই পীড়ার কারণ হয়, তবে পশুপতি তাহার জন্য দুঃখিত হইবেন কেন? বরং পাপের উপযুক্ত শাস্তি দেখিয়া, পশুপতি আহ্লাদিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। যখন স্বয়ং চারুশীলা এ কথা বলিতেছে, তখন আর পশুপতির মনে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই জন্মিতে পারে না। এখন পশুপতির অবস্থা আপনারা বুঝিতে পারিলেন কি?

পশুপতি এইবার প্রফুল্ল মনে বলিলেন,—"আচ্ছা, মা যে যেতে চাচ্ছেন, তার কি?"

চারুশীলা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"তিনি যান না, তিনি থেকে তো আমার সব করবেন! পিসিমা রয়েছেন, আর না হয় প্রসবের সময় মাকে ডেকে পাঠাব।"

পশুপতি।—তবে সেই কথাই ভাল।

চারুশীলা তখন সুযোগ পাইয়া, পুনর্ব্বার আরম্ভ করিল,—"মার আক্কেলটা দেখ্‌লে? বড়-বউ অন্তই তাঁর প্রাণ; আমার প্রতি তাঁর কি সে টান আছে?"

পশুপতি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ভগবান তোমায় দেখ্‌বেন। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা কর্‌বার আবশ্যক নাই।"

এখন পশুপতির এই দীর্ঘ-নিশ্বাসের অর্থ আপনারা কি বুঝিতে পারিলেন?

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

রামকমল তারাসুন্দরীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে পশুপতি-জননী ও বিধু ঝি তারাসুন্দরীর সঙ্গে আসিয়াছে। রামকমলের বাড়ী—কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে। বসত্‌-বাটী ভিন্ন ঐ অঞ্চলে তাঁহার আরও ৬।৭ খানা বাড়ী আছে, সে সকল বাড়ী তিনি ভাড়া দিয়া থাকেন। আজ দশ বৎসর হইল, রামকমলের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে তাহার পর তিনি আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তারা-সুন্দরী ব্যতীত রামকমলের আর এক পুত্র আছে, সে পুত্রের নাম সন্তোষকুমার। সন্তোষকুমার তারাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ। সন্তোষ-কুমারের জননী বড় মুখরা ছিলেন, সেই কারণ রামকমল সাংসারিক সুখে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং সেই মনের কষ্টেই আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। এক অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর কোন প্রকার সখ ছিল না, এবং সেই

কারণেই তিনি যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা ব্যয় করা অপেক্ষা সঞ্চয় করায় অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেই কারণ আশাতীত অর্থও সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কৃপণস্বভাব ছিলেন বটে, তবে অধর্ম্মপথে এক পয়সাও কখন উপার্জ্জন করিতেন না; এবং কাহারও নিকট কখন যদি এক পয়সা অন্যায়রূপে প্রতারিত হইতেন, তবে তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না। পত্নীবিয়োগের পরেও ব্রাহ্মণ সুখী হইতে পারেন নাই। সে অসুখের কারণ—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষকুমার। সন্তোষকুমারকে ভালরূপ লেখাপড়া শেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ অধিক ব্যয় করুন আর না করুন, কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। সন্তোষকুমার অল্প বয়সেই কুসংসর্গে মিশিয়া লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগ করিল না, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার চরিত্র দোষ ঘটিল। তখন সে একটা ব্যবসায়ী থিয়েটারের দলে মিশিল। সে দলে অনেক বারবিলাসিনী অভিনেত্রী ছিল। তাহাদের কুসংসর্গে থাকিয়া, সন্তোষকুমার দিনদিন অধঃপাতে যাইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুত্রের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। প্রথম প্রথম নানাপ্রকারে শাসন করিবার চেষ্টাও পাইলেন; কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন যে, সে শাসনেও কোন ফল হইল না, তখন ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া পুত্রকে আর কোন প্রকার শাসন পর্য্যন্তও করিতেন না। পুত্র ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের নিম্নতর সোপানে নামিতে আরম্ভ করিল।

অর্থ ও কুলমর্য্যাদার মহিমাগুণে মুগ্ধ হইয়া সন্তোষকুমারের অনেক বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। বিবাহ দিলে যদি চরিত্রের

সংশোধন হয়, এই আশায় ব্রাহ্মণও পুত্রের বিবাহের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র বিবাহ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হইল না। শেষে রামকমল বিরক্ত হইয়া কোন সম্বন্ধ আসিলে পুত্রের গুণের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া, সে সকল সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন সন্তোষকুমারের গুণের কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল, তখন তিনি পুত্রের বিবাহের অনুরোধ ও উপরোধের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

রামকমল পুত্রের মুখদর্শন করিতেন না, এবং তাহার কোন সংবাদও রাখিতেন না। পুত্রও পিতার সহিত বড় সাক্ষাৎ করিত না। সন্তোষকুমার কোন দিন বাড়ী আসিত, কোন দিন বাড়ী আসিত না, বাড়ীতে আসিলেও পিতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইলে, পুত্রকে বাধ্য হইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। সে সাক্ষাতের ফল হইত কিন্তু পিতাপুত্রে ভয়ঙ্কর বিবাদ; কারণ রামকমল তাঁহার অনেক কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের এক পয়সাও নষ্ট করিতে পুত্রকে দিতেন না। সময়ে সময়ে সন্তোষকুমার পিতৃগৃহে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিত। কখন বাক্স-সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অর্থ লইয়া যাইত, কখন বা পিতার কোন মূল্যবান্ দ্রব্য চুরি করিয়া বিক্রয় করিত, এবং সেই অর্থে বাবুগিরী করিয়া ইয়ার-মহলে যশস্বী হইত।

পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে রামকমল সাংসারিক সুখে এককালীন জলাঞ্জলি দিয়া ছিলেন। গৃহে তাঁহার এক বিধবা ভগিনী ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক ছিল না। সেই বিধবা ভগিনীর নাম বামাসুন্দরী। বামাসুন্দরী, রামকমলের কনিষ্ঠা।

বামাসুন্দরী বাল-বিধবা, সুতরাং পিতৃগৃহে আজন্ম পালিতা। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, সেই কারণ তিনি তারা-সুন্দরী ও সন্তোষকুমারকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তারাসুন্দরী শ্বশুরালয়েই থাকিত; সুতরাং এখন সন্তোষকুমারই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। মাতার মৃত্যুর পর সন্তোষ-কুমারের প্রতি তাঁহার আদরের মাত্রা বড়ই অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই অতিরিক্ত আদরেই সন্তোষকুমারের পরকাল নষ্ট হইল। বামাসুন্দরী সন্তোষকুমারকে এতদূর ভালবাসিতেন যে তাহার অতি জঘন্য চরিত্র-দোষ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। এমন কি, তিনি সে দোষ প্রাণপণে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং এই উপলক্ষে অনেক সময় ভ্রাতাভগিনীতেও বিবাদ চলিত।

আমরা রামকমলের সাংসারিক অবস্থার প্রথম আভাস-মাত্র দিলাম। অন্যান্য বিষয় ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামকমল তারাসুন্দরীকে কলিকাতায় আনিয়া প্রথমেই তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ কবিরাজ তারাসুন্দরীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হই-লেন। কবিরাজ মহাশয় প্রথম দিন রোগীকে দেখিয়া যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে রোগীর জীবনের আশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। তবে তিনি এই মাত্র আশা দিয়াছিলেন যে, এক সপ্তাহ ঔষধ সেবন না করিলে, এ রোগী

আরোগ্য হইবে কি না সে কথা নিশ্চয় বলিতে পারেন না; কিন্তু এক সপ্তাহ ঔষধ সেবনের পর, সে কথা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া কাহারও জানিবার আবশ্যক হয় নাই। তিন দিন ঔষধ সেবনের পর, রোগীর অবস্থার যেরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইল। কবিরাজ মহাশয় পর্য্যন্ত ঔষধের এরূপ আশাতীত ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি কেবল ঔষধের গুণে রোগীর অবস্থার এরূপ আশাতীত পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। প্রথমতঃ এত দিন রোগীর কোনরূপ চিকিৎসা বা শুশ্রূষা হয় নাই; পিতৃগৃহে আসিয়া চিকিৎসার সহিত রোগীর রীতিমত শুশ্রূষাও হইয়াছিল। পশুপতি-জননী, বামাসুন্দরী, বিধু ঝি এবং অন্যান্য দাসদাসীগণ প্রাণপণে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিল। তারাসুন্দরীর শুশ্রূষা-সম্বন্ধে আর এক বড় আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটন হইয়াছিল। যে সন্তোষকুমারকে কখন কোন দিন ২।৩ ঘণ্টার ঊর্দ্ধকাল কেহ পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে দেখে নাই, সেই সন্তোষকুমার আজ সপ্তাহকাল থিয়েটার ও ইয়ার-মহল প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, ভগিনীর শিয়রে বসিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত! বামাসুন্দরীর আনন্দের আর সীমা ছিল না; রোগ আরোগ্যলাভ অপেক্ষা এই ঘটনায় রোগীরও আনন্দের মাত্রা অধিক বাড়িয়াছিল। এই উপলক্ষে বামাসুন্দরী তাঁহার ভ্রাতাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেও পারিয়াছিলেন। রামকমল, সন্তোষকুমারের চরিত্র করিতে যেরূপ জঘন্য মনেন, তাহার চরিত্র যে সেরূপ জঘন্য নয়—এই ঘটনায় বামাসুন্দরী এই কথা ভ্রাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ পরে রোগী যেরূপ

দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, সন্তোষকুমারের রোগীর নিকট অবস্থান কালও সেইরূপ দিন দিন কমিতে আরম্ভ হইল ক্রমে যে সন্তোষ-কুমার সেই সন্তোষ-কুমারই দাঁড়াইল—কোন দিন আহারের সময় চুপি চুপি একবার আসিয়া আহার করিয়া যায়; কোন দিন বা সেরূপ একবার আসাও ঘটে না! তখন বামাসুন্দরীর আর মুখ রহিল না; উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি এক দিন তারাসুন্দরীকে বলিলেন,—"দ্যাখ তারা, আমার সন্তোষ তোকে বড় ভালবাসে, তোর ব্যারামের সময় বাছা আমার সাত দিন, সাত রাত্রি তোর কাছে জেগে বসে ছিল, এক দণ্ড কাছ ছাড়া হয় নাই। তুই যদি মা তোর দাদাকে বলে কয়ে বিয়ে করতে রাজী করাতে পারিস্। বিয়ে কর্‌লেই ঘরে মন বস্‌বে, কি বল বেয়াইন?"

বেয়াইন ঠাকুরাণী—তারাসুন্দরীর শাশুড়ী, সেই খানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তা বই কি দিদি। আর বিয়ে না কর্‌লে কি ভাল দেখায়?"

তারাসুন্দরী বলিল,—"কই—দাদা আর আমার কাছে আসেন না; আজ ৭.৮ দিন দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

পশুপতি-জননী তখন বলিলেন,—"ঘরে আসেনা—রাত্রে ঘরে থাকেনা, ছেলেটি বড় তো খারাপ হয়ে গেছে।"

বামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"না দিদি খারাপ হবে কেন? ছেলে বেলা থেকেই সন্তোষের গান বাজনায় সখ, তাই বাছা আমার সব সময় ঘরে থাকে না। সন্তোষকুমার বলে, গান-বাজনা বড় কঠিন বিদ্যে, লেখা-পড়া শেখার চেয়েও

নাকি শক্ত। বাছা আমার হাত পা নেড়ে থিয়েটারে কেমন একটো করে বেড়ায়, তা আর তোমায় কি বল্‌বো?—এই আস্‌ছে শনিবারে তোমায় দেখিয়ে আন্‌বো এখন।"

পশুপতি-জননী।—আচ্ছা বেয়াইন, আমরা শুনেছি, যারা থিয়েটার করে, তাদেরত স্বভাব চরিত্র ভাল নয়।

বামা।—না দিদি, আমার সন্তোষের স্বভাব চরিত্র খুব ভাল।

সে কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী বলিল,—"হাঁ পিসিমা, দাদা নাকি মদ খান্?"

বামা।—মদ আজকাল কে খায় না মা?

তারা।—দাদা নাকি বেশ্যাসক্ত?

বামা।—অমন বয়সে বিয়ে না করলে কে না বেশ্যাসক্ত হয় মা?

তারা।—দাদা নাকি ঘরের অনেক জিনিস পত্র নষ্ট করেছেন?

বামা।—তুইও দেখছি তোর বাপের রোগে গেছিস্। তোর বাপও তাকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না—তার সবই মন্দ দেখে, তোকেও দেখ্‌ছি যে তাই।

তারা।—না পিসিমা, তুমি রাগ কর কেন? আমি সেভাবে বল্‌ছি না। এসকল কথা শুন্‌লে মনে বড় কষ্ট হয়, আর হটাৎ বিশ্বাস কর্‌তেও ইচ্ছা হয় না, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

বামা।—তোর বাপই তো ছেলেটির মাথা খেলেন্। অত বড় উপযুক্ত ছেলে হয়েছে, তবু তার হাতে একটি পয়সাও দেবেন না। তা ঘরের জিনিষপত্র নষ্ট কর্‌বে না ত কি কর্‌বে? পরের ঘরে গিয়েত আর সিঁদ দিতে পারে না?

তারা।—দাদাকে একবার দেখা পেলে এইবার আমি তাকে মিনতি করে বিয়ে করবার জন্ম জেদাজিদি কর্‌বো।

এই সময় একজন দাসী আসিয়া বামাসুন্দরীকে বাবুর আগমন সংবাদ দিল। 'বাবু' অর্থে সন্তোষকুমার; কারণ রামকমলকে সকলে 'কর্ত্তা বাবু' বলিয়া ডাকিত। তখন বামাসুন্দরী তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই সন্তোষকুমারকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সন্তোষকুমার সে গৃহে প্রবেশ করিলে পর, বামাসুন্দরী ও পশুপতি-জননী সে গৃহে আর রহিলেন না। তখন সন্তোষকুমারকে একাকী পাইয়া, তারাসুন্দরী আরম্ভ করিল,—"দাদা, আজ ক'দিন আপনাকে দেখ্‌তে পাইনে যে।"

সন্তোষকুমার সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কেমন আছিস্?"

তারাসুন্দরী উত্তর করিল,—"আমি এখন ভাল আছি দাদা।"

সন্তোষ।—তবে আর তোকে দেখ্‌বার দরকার কি?

তারা।—আমায় দেখ্‌বার দরকার নেই, কিন্তু ঘরসংসার দেখ্‌বার দরকার আছে ত দাদা।

সন্তোষ।—বাবা যখন বেঁচে রয়েছেন, তখন আর আমার ঘরসংসার দেখ্‌বার দরকার কি?

তারা।—আপনি তাঁর উপযুক্ত ছেলে, তাঁর বয়সও হয়েছে, এখন আপনারত সে সকল দেখা উচিত।

সন্তোষ।—হাঁ—হাঁ, কি উচিত আর কি অনুচিত তা আর

তোকে আমার বুঝুতে হবে না। একে জ্বালাতন হয়ে মর্‌ছি—তুই তার উপর আর জ্বালাতন করিস্‌নে।

তারা।—কিসে জ্বালাতন হয়েছ দাদা—তোমার কিসের দুঃখ?

সন্তোষ।—আমার দুঃখের কথা তুই কি বুঝ্‌বি?

তারাসুন্দরী তখন আগ্রহের সহিত বলিল,—"কি কর্‌লে তুমি সুখী হও দাদা?"

দাদা তখন ভগিনীর মুখের উপরই স্পষ্ট বলিল,—"বাবা না মলে আর আমার অদৃষ্টে সুখ নাই।"

ভগিনী তো অবাক্! পিতার মৃত্যু-কামনা! তারাসুন্দরী ভ্রাতার এই কথায় হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইল। কিন্তু সে ভাবের কোন কথা প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"দাদা, তুমি যদি একটি বিয়ে কর, তা হ'লে সুখী হতে পার।"

"বিয়ে কর্‌বে; না তোমার মাথা কর্‌বে, আর আমার মুণ্ডু কর্‌বে"—এই কথা বলিয়া সন্তোষকুমার সে গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, আর তারাসুন্দরী অবাক্ হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী কলিকাতায় আসিয়া কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহার চিকিৎসার কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং সে চিকিৎসায় রোগের কোনরূপ উপশম হইয়াছে কি না—এই সকল সংবাদ এ পর্য্যন্ত পশুপতি কিছুই [illegible]লন নাই। পশুপতির ব্যবহারে

সকলেই বিস্মিত! মানুষ কি এত নীচ হইতে পারে? এ বিশ্বাস হঠাৎ মনের ভিতর স্থান দিতে ইচ্ছা করে না। কলিকাতা হইতে কোন্নগর অধিক দূর নয়, আর পশুপতি এক রবিবার ব্যতীত প্রতিদিনই কলিকাতায় চাকরী উপলক্ষে আসিয়া থাকেন, তত্রাচ পশুপতি তাঁহার স্ত্রীকে সেরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পাঠাইয়া দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন—একথা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমরা জানি, পশুপতির নিন্দা করিলে সেই সতীলক্ষ্মী তারাসুন্দরীর হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে, সেই কারণে এস্থলে তাহার ব্যবহারের কথা কেবল উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

তারাসুন্দরী শারিরীক রোগ হইতে আরোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মানসিক রোগের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। তাহার অলৌকিক সহিষ্ণুতা গুণই তাহার বাহ্যিক আকারে, সে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেয় নাই। আবার ঈশ্বরের সার্ব্বমঙ্গল্যেও তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আর হিন্দুরমণী পূর্ব্বজন্ম ও অদৃষ্ট না মানিয়া থাকিতে পারে না, সেই কারণ তারা তাহার মনকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিল, তাহা না হইলে এতদিন নিশ্চয় উন্মাদিনী হইত। তারা তাহার মনকে স্থির করিবার আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল, তারা অনেক সময় দেবদেবীর পূজায় নিযুক্ত থাকিয়া, তাহার অস্থির চিত্তকে স্থির করিত। অনেক সময় আবার মহাদেবের ধ্যান করিতে গিয়া অজ্ঞাতে স্বামীমূর্ত্তি ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইত, তখন মহাদেবের স্থান পশুপতি আসিয়া অধিকার করিত। পশুপতি আর মহাদেব—তবে কি নামের গুণেই এইরূপ হইত? আর এক কথা—প্রিয় বস্তু দূরে থাকিলে

প্রিয়তম হইয়া দাঁড়ায়, তখন কি তাহাকে আর দূরে রাখা যায়? তখন সে জোর করিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

এদিকে মাতৃস্নেহেরও কি অপার মহিমা দেখ! যে পশুপতি-জননী পুত্রের নামে জ্বলিয়া উঠিতেন, পাড়ায় পাড়ায় পুত্রের নিন্দা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করিতেন না, আজ সেই পশুপতি-জননী পুত্রের সংবাদ না পাইয়া অস্থির হইয়াছেন। বামা সুন্দরী পশুপতির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহারই সম্মুখে, তাঁহার পুত্রের অনেক নিন্দা করিত, কিন্তু জননীর সে নিন্দা প্রাণে সহ্য হইত না। তবে কি পশুপতি-জননী কেবল পরের মুখে কোন আত্মীয়ের নিন্দা শুনিতে ভালবাসিতেন না? একথা আমরা কিরূপে স্বীকার করিব? ঐ যে বিধু ঝি দিনের মধ্যে সাতবার চারুশীলার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার অজস্র নিন্দা ও তাহাকে অজস্র গালিবর্ষণ পর্য্যন্ত করিতেছে, তাহাতেত পশুপতি-জননীর হৃদয় উল্লাসিত ব্যতীত কিছুমাত্র ব্যথিত হয় নাই! এই সময় পুত্রের সংবাদের জন্য জননীকে বড় অস্থির দেখিয়া, তারাসুন্দরী এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। তিনি গোপনে একজন ভৃত্যকে স্বামীর আফিসে মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার সংবাদ লইতে লাগিলেন। — —

একদিন বৈকালে সেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, আমাদের জামাই বাবুর একপুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে। ভৃত্য জানিত যে ইহা একটা অশুভ সংবাদ, সুতরাং সে অনেক চেষ্টা করিয়াও গোপন রাখিতে পারে নাই। কিন্তু তারাসুন্দরী এ সংবাদে এতদূর আহ্লাদিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আপনার হাতের বালা খুলিয়া সেই ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ পুরস্কার করিলেন।

পশুপতি-জননী যে সংবাদে তখন কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে কোন্নগর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দিন কোন স্থানে যাত্রা করিবার পক্ষে শুভ দিন নহে, সেই কারণ রামকমল ও বামাসুন্দরী কেবল সেই দিনটি থাকিয়া, তাহার পরদিন যাত্রা করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সে বাধা কোন মতেই মানিলেন না। বর্ষার নদীর স্থায় এখন পশুপতি-জননীর হৃদয় বেগবতী—সে হৃদয় কি এ সকল সামান্য বাধা মানিতে পারে ?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি-জননী যখন কোন্নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং বাড়ীতে পৌঁছিয়ে পশুপতির সঙ্গে তাঁহার এখন আর সাক্ষাৎ হইল না, পশুপতি ইহার পূর্ব্বেই আফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমেই বিশ্বেশ্বরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বেশ্বরী তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"এস, এস, দিদি এস। তোমার কি সোণার চাঁদ নাতী হয়েছে, দেখ্‌বে এস।"

পশুপতি-জননী কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর সে অভ্যর্থনার কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে অন্দরবাড়ীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরী কোথায় যাইতেছিল, তাহার সে সময় আর সেখানে যাওয়া হইল না, তাঁহার পশ্চাতেই ফিরিয়া চলিল, কিন্তু নীরবে

নহে। বিশ্বেশ্বরী আরম্ভ করিয়াছে,—"ঘরের গিন্নী না থাক্‌লে কি আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে গা? এখন গিন্নী এসে পৌঁছিয়েছে, এখন আমরা আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বো। বৌ ছুঁড়ি তো শ্বাশুড়ী শ্বাশুড়ী করে একবারে সারা হয়ে গেল। ওলো কে আছিস্, তোরা শাঁক বাজালো—শাঁক বাজা।"

পশুপতি-জননীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে বিশ্বেশ্বরী তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিতেছে—এ দৃশ্য কি তাঁহার প্রাণে সহ্য হইতে পারে? বৃশ্চিক দংশনে শরীরে যেরূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভব হয় বিশ্বেশ্বরীর প্রতি কথায় তিনি সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরীর এই কয়েকটি কথায় তাহার মনে অনেক কথা উদয় হইতে লাগিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহাকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই,—এরূপ আনন্দের দিনেও তাঁহাকে আনিবার জন্য কোন লোক পাঠান হয় নাই,—এই সকল কথা যখন তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, তখন তাঁহার শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। কিন্তু এ সময়ে চক্ষের জল পড়িলে পাছে তাঁহার পৌত্রের কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় অতি কষ্টে সেই পতনোন্মুখ চক্ষের জল নিবারণ করিয়া রাখিলেন। তিনি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, একবারে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া, বড় সাধের পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। পৌত্রমুখ দেখিয়া পশুপতি জননীর আর আনন্দের সীমা নাই,—পুত্রের অসম্মান, পুত্রবধূর অত্যাচার—এ সকল কোন কথা এখন আর তাঁহার মনে স্থান পায় না। তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!

চারুশীলার প্রকৃতি যতই নীচ হউক না কেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, চারুশীলা এ সময় শাশুড়ীকে যথোচিত সম্মান করিতে কোনরূপ ত্রুটি করে নাই। চারু প্রণাম করিয়া বলিল—"মা, তোমার কেমন নাতী হয়েছে দেখ। এখন আশীর্ব্বাদ কর—যেন চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।"

পশুপতি-জননীও সে প্রণাম আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া, বলিলেন,—"জন্ম-এয়েস্ত্রী হও মা। আর আমার মাথার যত চুল, তোমার ছেলের তত গুণ পেরমাই হউক।"

হইতে পারে, চারুশীলা পুত্রের মঙ্গল কামনায় শাশুড়ীর পূর্ব্ব-ব্যবহার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া এখন ভক্তির সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে; হইতে পারে, পশুপতি-জননীও পৌত্র-মুখ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণেকের জন্য পুত্রবধূর দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া গিয়া এখন প্রাণের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; কিন্তু তাহা হইলেও, এরূপ সুখ-সম্মিলন কি বিশ্বেশ্বরীর প্রাণে সহ্য হইতে পারে? তখন বিশ্বেশ্বরী আর কি বলিবে? বিশ্বেশ্বরী অভ্যাস গুণে, তাহার সেই হলাহল পরিপূর্ণ হৃদয় হইতে অমৃত-বর্ষণ আরম্ভ করিল,—"বলি হাঁ বউ, নাতীর মুখ কি দিয়ে দেখ্‌লি?"

পশুপতি-জননী এ কথার উত্তর না দিয়া আর অব্যাহতি পাইলেন না; সুতরাং বলিতে বাধ্য হইলেন,—"আমি আর কি দিয়ে মুখ দেখ্‌বো বোন?"

বিশ্বেশ্বরী, তখন পুনরায় আরম্ভ করিল,—"ওমা, সে কি কথা মা! লোকে শুন্‌লে বলে কি? তাতে আবার গ্রামের

মধ্যেই বউয়ের বাপের বাড়ী। কুটুম্বুর কাছে কি করে মুখ দেখাবে, বোন ?"

পশুপতি-জননী পুনরায় বলিলেন—"তোরা কি জানিস্‌নে—আমার হাতে কি আর কিছু আছে ? আমার হাতে যা কিছু ছিল, আমি সবই তো ছোট বউমাকে দিয়েছি।"

বিশেশ্বরী।—সে দেওয়া এক, আর এ দেওয়া এক। মাগি, এমন আনন্দের দিন তুই আর কি কখন পাবি ?

পশুপতি-জননী।—আচ্ছা, তোরা বল্‌ছিস্‌, আমার ছেলে ঘরে আসুক। আমি ছেলের কাছে কিছু চেয়ে নিয়ে খোকার হাতে দেবো।

বিশেশ্বরী।—সে আবার কি রকম দেওয়া হলো ?

বিশেশ্বরী যে ভাবে কথা কহিতে লাগিল, তাহাতে শাশুড়ীর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"আমি খোকাকে যা দেবো, সেও আমার ছোট বউমার হবে।"

বিশেশ্বরী।—তা ত জানি, কিন্তু ছেলের কাছে থেকে নিয়ে কি দেওয়া ভাল হয় ?

শাশুড়ী।—ছেলের টাকা কি আমার টাকা নয় ?

বিশেশ্বরী এবার হাসিতে হাসিতে বলিল—"সে কথা তোমার বোন এ বিষয়ে খাট্‌বে না।"

বিশেশ্বরীর কার্য্যোদ্ধার হইয়া গিয়াছে। চারুশীলা ও পশুপতি-জননীর আনন্দ সাগরে এখন বিষাদের তরঙ্গ উঠিয়াছে। শাশুড়ীর প্রতি চারুশীলার মনের ভাব আর সেরূপ নাই; তবে আমরা মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না, চারু এ সময় সে মনের

ভাব প্রকাশ করিয়া শাশুড়ীকে কোন কর্কশ কথা বলে নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পশুপতি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর জননী পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুত্র আজ জননীকে প্রণাম করিলেন। জননী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন —"বাবা, আমি তোমার ছেলে দেখ্তে এসেছি।"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"বেশ করেছ মা। সেখানকার সকলে ভাল আছে তো?"

জননী।—সে সংবাদে তোমার দরকার কি বাবা? সেই মরণাপন্ন বউটিকে নিয়ে গেলুম, বাঁচলো কি মলো, একবার খবর নেওয়া কি তোমার উচিত ছিল না?

পুত্র।—আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার কন্যাকে নিয়ে যাবার সময় আমার প্রতি বড় রাগ প্রকাশ করেছিলেন, সেই জন্য তাঁহার বাড়ী যেতে, কি কোন লোক পাঠাতে আমার ইচ্ছা হয় নাই।

জননী।—আচ্ছা, সে কথা যা'ক। তোমার আজ ছ'দিন ছেলে হয়েছে, তা এর মধ্যে আমায় একটা সংবাদ দেওয়া কি তোমার উচিত ছিল না বাবা?

পুত্র।—সে সংবাদ পেলে তোমার আহ্লাদ হতে পারে, কিন্তু সেখানে আরও যারা আছে, তাদের পক্ষে তো এ আহ্লাদের সংবাদ নয়।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই সময় জননী, তারাসুন্দরীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, পুত্রকে দুই এক কথা বলিবেন। তাঁহা-রই সম্মুখে যে উন্মত্তহৃদয়া পুত্রবধূ সপত্নীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া

আহ্লাদে আপনার হাতের বালা খুলিয়া সংবাদদাতাকে পুরস্কার দিয়াছিল, সে পুত্রবধূর সম্বন্ধে পুত্রের মনের এরূপ কলুষিত ভাব দূর করা কি জননীর উচিত ছিল না? কিন্তু জননীর বুদ্ধি সেরূপ তীক্ষ্ণ ছিল না, তিনি এখন বড়বধূর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেও, কিরূপে তাহার মঙ্গল হইতে পারে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি এই সময় বলিলেন—"কুটুম্ব বাড়ীতে রয়েছি, তোমায় ছেলে হয়েছে, তবু আমায় কেউ নিতে গেল না। —আমি আপনি চলে এলুম, এতে কার মান বৃদ্ধি হলো বাবা?"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, জননী আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। শুভ অশুভ, কি মঙ্গল অমঙ্গল, কোন কথাই তাঁহার আর মনে হইল না। কেবল দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল নহে, ক্রমে জননী রীতিমত ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। পুত্রের] প্রতি তাঁহার যে অভিমান বা রাগ ছিল, এই ক্রন্দনেই তাহার অস্তিত্বের লোপ হইতে পারিত, এবং পুত্রেরও জননীর প্রতি যে অভিমান বা রাগ ছিল, এই সঙ্গে সঙ্গে তাহাও দূর হইত—যদি এই সময় এই স্থলে বিশ্বেশ্বরীর শুভাগমন না হইত। বিশ্বেশ্বরী অন্তরালে থাকিয়া মাতা-পুত্রের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া দর্শন দিল। দর্শন দিয়াই বিশ্বেশ্বরী আরম্ভ করিল,—"হাঁ বউ, তোর আক্কেলখানা কি? এই ষেটেরা পূজোর সময় তুই কাঁদ্‌তে বস্‌লি? এই কি তোর কাঁদ্‌বার সময়? আহা, কত কষ্টে এক রত্তি হয়েছে, আজ্‌কের দিনে তোর চক্ষের জল পড়্‌লে কি আর রক্ষে আছে? আহা! বউ ছুঁড়ী শাশুড়ী বলে মুখে কিছু বল্‌তে পারে না, কিন্তু ভয়ে একবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে?"

পুত্রের অকল্যাণ, আর চারুশীলা ভয়ে আড়ষ্ট—সুতরাং পশুপতির মনের অবস্থা এ ঘটনায় কিরূপ হইবে, তাহা কি আর বলিবার আবশুক আছে? বিশ্বেশ্বরীর কথায় জননীর ক্রন্দনের মাত্রার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং এক ক্রন্দন ব্যতীত জননী নিজের স্বপক্ষে কোন কথাই বলিতে পারিল না। এরূপ স্থলে আর কি হইতে পারে? সেই বিশ্বজয়ী বিশ্বেশ্বরীরই জয় হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারের সকল প্রকৃতি এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। এ সংসারে যত মনুষ্য, মনুষ্য-প্রকৃতিও তত বিভিন্ন প্রকার। সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেও, সমান প্রকৃতির দুইটি মনুষ্য এ সংসারে পাওয়া যায় না। আবার পৃথিবীর সমস্ত জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে একটা একটা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আছে; যেমন ব্যাঘ্রের প্রকৃতি বড় হিংস্রক, শৃগালের প্রকৃতি বড় ধূর্ত্ত, কুকুরের প্রকৃতি বড় প্রভুভক্ত ইত্যাদি। কিন্তু এক মনুষ্য-প্রকৃতিতে সকল শ্রেণীর জীবের প্রকৃতিই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই কি মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ?

সকল মনুষ্যের রক্ত, মাংস, অস্থি ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য তো সমান; তবে কেহ পরের দুঃখে ম্রিয়মাণ, আর কেহ বা সেই দুঃখ দেখিয়া উল্লাসিত হয় কেন? একজনকে বিপন্ন দেখিয়া একজন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও সেই বিপন্নের উদ্ধারের

জন্ম ছুটিতেছে, আবার তাহারই পশ্চাতে অন্য একজন মড়ার উপর খাঁড়ার আঘাত করিতে দৌড়াইতেছে কেন? তোমার আনন্দের দিনে তোমার কত আত্মীয় সে আনন্দে যোগ দিয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন; আবার তোমার এমন আরও কত আত্মীয় আছেন, তোমার সেই আনন্দ যাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়াছে। সেই কারণই আমরা বলিতেছিলাম, এই সংসারের সকল প্রকৃতি এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না।

পশুপতি-জননীর সহিত বিশ্বেশ্বরীর সৌহৃদ্যের কথা গ্রামে বিশেষ রাষ্ট্র ছিল, এবং এমন কোন ঘটনাও ঘটে নাই, যাহাতে সে সৌহৃদ্য নষ্ট হইতে পারে; তথাপি কেন যে বিশ্বেশ্বরী পশুপতি-জননীর শত্রুতা করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার যেটুকু বুঝিতেও পারি, তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এক একটা মনুষ্য-প্রকৃতি আছে, যাহারা এ সংসারের কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। অনেক সময় তাহারা পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজেরও অনিষ্ট করে, তথাপি তাহাদের চৈতন্য হয় না। এ সংসারে যদি সকল মনুষ্য সমান প্রকৃতির হইত, তবে কি আর কোন দুঃখ থাকিত?

পশুপতি-জননী এতদিন পরে বিশ্বেশ্বরীকে চিনিতে পারিয়াছেন। পশুপতি-জননীর প্রকৃতি বড় সরল, সুতরাং বিশ্বেশ্বরীর কুটিলতা বুঝিতে যে তাঁহার এত বিলম্ব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মনুষ্য আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী অন্যের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাতেইত এত গোলযোগ হয়। এ সংসারে মানুষ চেনা বড়ই কঠিন; যিনি এই

কার্য্যে যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনিই ততদূর বুদ্ধিমান।

পশুপতি-জননীর সেরূপ বুদ্ধি ছিল না, তাহাতেই তো তাঁহার সংসারে এত বিভ্রাট বাধিয়া গেল। কেবল সংসারের কুলান-অকুলান দেখিলেই যে যথেষ্ট গৃহিণীপনা হয় না—এই কথাইত আমরা পশুপতি-জননীর চরিত্রে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি।

আর সকল মনুষ্য-প্রকৃতি যদি সমান হইত, তবে তারাসুন্দরীর এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? তারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে এ বয়সেই তাহাকে সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে? তাহার সেই অমানুষিক ত্যাগ-স্বীকার ও অলৌকিক সহিষ্ণুতার পুরস্কার কি শেষে এই হইল? আমরা তাই বলিতেছিলাম যে, তারাসুন্দরী যে সকল গুণে ভূষিতা, সে সকল গুণের কতক অংশ যদি চারুশীলাতে থাকিত, তবে কি পশুপতির সংসারে এরূপ বিভ্রাট ঘটিত?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পশুপতি-জননী বড় অশুভদিনে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং অশুভদিনে আসিবার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন বিশ্বেশ্বরী কৌশলে তাঁহার সহিত যে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে সে সদ্ভাব নষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড কোন্দল আরম্ভ হইয়াছে। পশুপতি জননী কোন্দলে অভ্যস্ত থাকিলেও, বিপক্ষপক্ষে

কোন্দলে বিশ্বজয়ী বিশ্বেশ্বরী ও চারুশীলা—এই দুইজনের সমকক্ষ কিরূপে হইবেন? সুতরাং পদে পদে তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। এই সকল ঘটনায় মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন তাঁহার আহার পর্য্যন্ত হইত না। এখানে আসিয়া একদিনের জন্য তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। পশুপতিও জননীর উপর বড়ই বিরক্ত। দোষ যাহারই থাকুক, বিশ্বেশ্বরী ও চারুশীলা এরূপ কৌশল করিত, যে সে কৌশলে পশুপতির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যাইত যে, সকল দোষের আকর তাঁহারই জননী। পশুপতি-জননী কোন্দলে কোন প্রকার কৌশল খাটাইতে জানিতেন না, সুতরাং পুত্রের নিকট তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পশুপতির অনাটন বড় ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পশুপতির এখন অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। আয় অপেক্ষা খরচ প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং সে দেনা ক্রমেই বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাসের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। লোকে অভাবে পড়িলে হিতাহিত-জ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে; ক্রমে পশুপতির অবস্থাও তাহাই ঘটিল। পশুপতি আফিসের অনেক টাকা ভাঙ্গিয়া বসিলেন। গবর্ণমেণ্ট আফিস হইলে এত শীঘ্র ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এবং ধরা পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না; কিন্তু সওদাগরী আফিসের টাকা হজম করা বড় সহজ নহে, পশুপতি অচিরাৎ ধরা পড়িলেন। আফি-সের বড় সাহেব তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, সুতরাং অন্য কোন রূপ দণ্ড না হইয়া কেবল তাঁহার চাকুরিতে জবাব হইল।

সুতরাং পশুপতির অবস্থা এখন আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। দেনা পরিশোধ এবং পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য

অগত্যা তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইল। চারুশীলার অনেক অলঙ্কার ছিল বটে, কিন্তু সে অলঙ্কার বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতেও পশুপতির সাহস হইল না। পশুপতির অবস্থা যখন এইরূপ, তখন এরূপ একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটিল, যে ঘটনায় আমাদের উপন্যাসবর্ণিত অনেকের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইল।

একদিন প্রাতে হঠাৎ তারাসুন্দরীর পিত্রালয় হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে গতকল্য বৈকালে তাহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে, সেই কারণে তারাসুন্দরীর আজ্ঞামতে সে এ বাড়ীর সকলকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। পশুপতি তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু একজন ভৃত্যের বাচনিক সংবাদে সে স্থলে যাইতে সম্মত হইলেন না। ভৃত্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"জামাই বাবু, আপ্নি সে অভিমান কর্‌বেন না—আপনাকে কে পত্র লিখ্‌বে ?"

পশুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কেন ? যার পিতার মৃত্যু হয়েছে, সে কি ভগিনীপতিকে একখানা পত্র লিখে সংবাদ দিতে পারে না ?"

ভৃত্য।—কর্ত্তা বাবু যে দাদা বাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করে গেছেন। এখন তাঁর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েছেন—দিদি বাবু। দিদি বাবুই শ্রাদ্ধশান্তি কর্‌বেন। দাদা বাবু যে মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন।

পশুপতি এবার বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন এরূপ হলো ?"

ভৃত্য উত্তর করিল,—"আপনি কি দাদা বাবুর স্বভাব-চরিত্রের বিষয় জানেন না? তাঁর হাতে বিষয় পড়লে ক'দিন থাকবে? আর বিষয় ত অল্প নয়, সকল রকমে প্রায় ৭। ৮ লাখ টাকা।"

পশুপতি বসিয়াছিলেন, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটা তাড়িত-প্রবাহ যেন হঠাৎ তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে সংবাদে তিনি আনন্দিত কি দুঃখিত হইলেন, তাহা তখন বুঝিতে পারা গেল না। পশুপতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তিনি কি কোন উইল করে গেছেন?"

ভৃত্য।—আজ্ঞে হাঁ।

পশুপতি।—সে উইলে সাক্ষী আছে কে?

ভৃত্য।—একজন হাইকোর্টের উকিলকে ডেকে সে উইল লেখা হয়; আর তাতে কল্‌কাতার অনেক বড়লোক সাক্ষী আছেন।

পশুপতি।—তুই এ সকল কথা কি ক'রে জান্‌লি?

ভৃত্য।—উইল যখন লেখাপড়া হয়, তখন আমি সেখানে ছিলুম; উইল পড়া হ'লে আমি নিজে সে সকল কথা শুনেছি।

পশুপতি।—তোর দাদা বাবু সে সময় সেখানে ছিল?

ভৃত্য।—দাদা বাবুর সঙ্গে কর্ত্তা বাবুর ব্যারাম হয়ে পর্য্যন্ত দেখাই হয়নি। মঙ্গলবার রাত্রে তাঁর ব্যারাম বৃদ্ধি হয়। তখন কর্ত্তা বাবু আমাকে দাদা বাবুকে ডাকতে পাঠান। আমি তাঁর আড্ডা জান্‌তুম, সে একটা বেশ্যার বাড়ী। আমি বুধবার সকালে তাঁকে ডাকতে যাই, আর কর্ত্তার ব্যারামের কথাও বলি। তিনি কোন মতেই এলেন না; আমি অনেক জেদ কল্লুম, আর তাঁর

বাঁচ্‌বার সম্ভাবনা নাই এ কথাও বল্লুম। তিনি বল্লেন কি জানেন,—"বাবাকে বলিস্, তিনি মর্‌লে তবে আমি যাব।" তাঁর সেই বেশ্যাটা তখনি কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মান্‌সিক কর্‌লে; সেখানে আর আর যে যে ছিল, সকলেই বেশ আহ্লাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি ফিরে এসে কর্ত্তাকে সব কথা বল্লুম্; একে ব্রাহ্মণ, তায় মনিব, মিথ্যা কথা কিরূপে বলি? তিনি সেই দিন তাঁর বন্ধুবান্ধবকে ডেকে একটা কি পরামর্শ কর্‌লেন; তারপর বৃহস্পতিবার উইল লেখা-পড়া হ'ল, আর কাল্ রবিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পশুপতি।—মুখাগ্নি কে কর্‌লে?

ভৃত্য।—দিদি বাবু।

পশুপতি।—তোর্ দাদা বাবু শ্রাদ্ধও কর্‌বে না?

ভৃত্য।—উইলে তাঁকে শ্রাদ্ধ কর্‌তে নিষেধ আছে। সেই-জন্যই ত আমি এত তাড়াতাড়ী এসেছি। এখন আপনাকেই সব কর্‌তে হবে। আর সময় কোথা? দিদি বাবু চার দিনের দিন শ্রাদ্ধ কর্‌বেন, তার আজ দুদিন হ'ল। আপনারা সকলে চলুন—এ বাড়ীর সকলকেই নিয়ে যেতে বলেছেন।

পশুপতি।—তুই একটু বস্, আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আস্‌ছি।

এইবার পশুপতি, আনন্দে অধীর হইয়া, দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পশুপতি আর কাহার কাছে যাইবেন? দৌড়িয়া চারুশীলার কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারুশীলা জাগ্রত ছিল বটে, কিন্তু তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই। পশুপতি আসিয়াই তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"শীঘ্র উঠ, একটা বড় সংবাদ আছে।"

চারুশীলা শয্যা ত্যাগ না করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তভাবে বলিল,—"সকালবেলাআবার কি ঢং কর্‌তে এলে?"

পশুপতি আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"ঢং নয়, সত্যঘটনা, কলিকাতায় আমার শ্বশুর মহাশয় কাল্ মারা গেছেন।"

পশুপতির এই কথা শুনিয়া, চারুশীলা এইবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, এবং আগ্রহের সহিত বলিল,—"কে? বড় দিদির বাবা?"

পশুপতি।—হাঁ।

চারুশীলার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল। এ জগতে সতিনীর একমাত্র আশ্রয়স্থল যে পিতা, তাহারই মৃত্যু-সংবাদ! সুতরাং চারুশীলা কি সে আনন্দের বেগ ধারণ করিতে পারে? চারুশীলার অধর প্রান্তে তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। চারুশীলা তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"তা এ সংবাদ কোথায় পেলে?"

পশুপতি।—এই সংবাদ নিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী থেকেই একজন চাকর এসেছে।

চারুশীলার আর অবিশ্বাসের কারণ নাই, সুতরাং তাহার সেই

অধরপ্রান্তের হাসি এখন আর অধরে ধরিতেছে না। যে কারণেই হউক, পশুপতির হৃদয়ও এখন আনন্দে উল্লাসিত; সুতরাং পশুপতি সেই মধুর হাসি দেখিয়াও মোহিত হইয়া গিয়াছেন। সত্য কি সে হাসি এত মধুর? সে হাসি মধুর হউক বা না হউক, চারুশীলা কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই মধুবর্ষণ আরম্ভ করিল,—"বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে, এইবার তার তেজ, অহঙ্কার, দর্প সব চূর্ণ হবে।"

বৈদ্যুতিক আলোকের পর-মুহূর্ত্তেই যেমন বজ্রাঘাত, এ মধুর হাসির পর-মুহূর্ত্তেই তেমনি এই মধুবর্ষণ! হঠাৎ বজ্রাঘাতে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, সেই মুখ, চক্ষু ও দর্শন-শ্রেণীর ভঙ্গিমার সহিত এই মধু-বর্ষণেও পশুপতি তেমনি চমকিয়া উঠিলেন! কোথা সেই প্রফুল্ল মুখকমলের ঐ মধুর হাসি, আর কোথা এই হিংসাদ্বেষ-পরিপূর্ণ অতি ভীষণ মুখাকৃতির গরল উদ্গীরণ! এত শীঘ্র এরূপ পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়া কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু এই বিস্ময়ের সহিত পশুপতির চৈতন্যেরও উদয় হইল। চারুশীলার প্রকৃতি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। যাহার একবার পদস্খলন হয়, তাহার কি আর চৈতন্য হয় না? অনেক সময় চৈতন্য হয় বটে, কিন্তু সকল সময় সে চৈতন্যকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

পশুপতি পুনরায় বলিলেন,—"আর একটা সংবাদ আছে।"

চারুশীলা শয্যার উপর বসিয়াছিল, এইবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তার অদৃষ্ট কি এতই সুপ্রসন্ন যে, শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তাহার উপর কেবল শুভ সংবাদ বৃষ্টি হইতে থাকিবে? চারুশীলা আনন্দে উল্লাসিত হইয়া

স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"কি ?—কি ?—বলনা—বলনা ?"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"আমার শ্বশুর মর্‌বার সময় যে উইল ক'রে গেছেন, তাতে ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র ক'রে, মেয়েকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী ক'রে গেছেন।"

তৎক্ষণাৎ চারুশীলার বুক যেন ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল, কে যেন হঠাৎ একটা তপ্ত লৌহশলাকা তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। সেই হাসির ফোয়ারাও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। একটী দ্রুতচালিত কল হঠাৎ বন্ধ হইলে যেরূপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতনাড়া আর ঘাড়নাড়াও সেইরূপ বন্ধ হইল। কিন্তু এ কথা চারুশীলা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিল না; সুতরাং শুষ্কমুখে ও বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"এইবার কি তামাসা আরম্ভ কর্‌লে নাকি ?"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"তামাসা নয়, এ কথাও সত্য।"

চারুশীলা।—এ সংবাদ তোমায় কে দিলে ?

পশুপতি।—যে মৃত্যু-সংবাদ আনিয়াছে, সেই লোকই এই সংবাদ দিয়াছে।

তাহার অমন শতসহস্র মৃত্যু-সংবাদ চারুশীলা হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার এরূপ অরুচি-কর সংবাদ হঠাৎ কিরূপে চারুশীলা বিশ্বাস করিবে ? সেই কারণ বলিল,—"তুমি বোধ হয়, ঘুমের ঘোরে কি শুন্‌তে কি শুনেছ। তা' নইলে ছেলে থাক্‌তে এও কি কখন সম্ভব হতে পারে ?"

পশুপতি তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমার ঘুমের ঘোরে শোনা নয়, এরূপ হ'বার বিশেষ কারণও আছে।"

এই বলিয়া, পশুপতি সন্তোষকুমারের পূর্ব্ব চরিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, শ্বশুর মহাশয়ের পীড়ার সময় তাহার ব্যবহারের বিষয়, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এইবার চারুশীলার হরিষে বিষাদ হইল। চারুশীলা পুনরায় শয্যাশায়ী হইলেন। পশুপতির সেই উদিত চৈতন্য এখনও লোপ পায় নাই, সুতরাং তিনি চারুশীলার হর্ষ ও বিষাদের কারণ বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়া দুঃখিতও হইলেন। তখন তিনি আরম্ভ করিলেন, —"এখন শুলে চল্‌বে না। আমাদের সকলকে কলিকাতা থেকে নিতে এসেছে যে—সেখানে যাবার কি বল ?"

চারুশীলার উত্তর নাই, একটা গভীর চিন্তা চারুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পশুপতি পুনরায় একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"তোমার সেখানে যা'বার কি আপত্তি আছে ?"

চরুশীলা তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তোমার এ কথা জিজ্ঞেস্ বল্‌তে লজ্জা করে না ? কত কষ্টের পর যা'হ'ক একরত্তি হয়েছে, আমি একে নিয়ে সেই শত্রুপুরীতে শ্রাদ্ধ খেতে যাব ? তা'হলে বাছাকে কি আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আন্‌তে পার্‌ব ?"

শেষ কথা কয়টি বলিতে বলিতে চারুশীলা পার্শ্বে নিদ্রিত শিশুকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইল, এবং সেই গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ বর্ষণ আরম্ভ হইল। চারুশীলা কাঁদিয়া আকুল !

আর পশুপতি ? পশুপতির কি হইল ? আবার কি হইবে ? এইবার পশুপতিরও চৈতন্যলোপ ! পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত পশুপতি স্বচক্ষে চারুশীলার ক্রন্দন দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? পশুপতির অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু

তাঁহার গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল। পশুপতি সে অশ্রু মুছিয়া চারুশীলাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"আমি সে কথা প্রথমে বুঝ্তে পারিনি। তোমার সেখানে যা'বার আবশ্যক নাই; মা আর আমি যাই।"

তৎক্ষণাৎ বর্ষণ বন্ধ হইল, পুনরায় উঠিয়া বসিয়া চারুশীলা গর্জ্জন করিল,—"কি! তুমি যাবে—তুমি যাবে? আচ্ছা যাও, কিন্তু ফিরে এসে আমায় আর দেখ্তে পাবে না।"

এ গর্জ্জনে পশুপতি কিছু ভীত হইলেন, এবং চারুশীলার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া, বিনতিভাবে বলিলেন,—"আমি না গেলে শ্রাদ্ধের সময় কে দাঁড়াবে? প্রায় ৭।৮ লাখ টাকা নগদে আর বিষয়ে যে লোক রেখে গেছেন, তাঁর শ্রাদ্ধটা ত ভালরূপ হওয়া চাই।"

পুনরায় গর্জ্জন হইল,—"কি! সাত আট লাখ টাকা! এঁ্যা—সাত আট লাখ্ টাকা!! মিথ্যা কথা!"

পশুপতি সেইভাবেই বলিলেন,—"মিথ্যা কথা নয়। আমার শ্বশুর মহাশয় বড় কৃপণ ছিলেন, তাই এত টাকা রেখে গেছেন।"

"এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমার বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিব।"এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতেই চারুশীলা পুনরায় শয্যাশায়ী হইল।

এবারকার ভাবগতিক দেখিয়া, পশুপতি ভয়ে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়াই প্রাঙ্গণে জননীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ

হইল। পশুপতি বাড়ীর ভিতর আসিলে, তাঁহার জননী বাহির বাড়ীতে গিয়া ভৃত্যের মুখে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। প্রথমেই পশুপতি বলিলেন,—"শ্বশুর মারা গেছেন, তোমায় কলিকাতা থেকে নিতে এসেছে যে।"

জননী প্রথমে কোন উত্তর দিবেন না মনে করিলেন, কারণ, পশুপতি তাহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করে নাই। আচ্ছা, পশুপতি এত কথা বলিতে পারিল, আর তাহার সঙ্গে ক্ষুদ্র 'মা' কথাটি বলিতে পারিল না! ঐ ত পশুপতির রোগ। কিন্তু শেষে আবার কি ভাবিয়া, জননী উত্তর করিলেন,—"আমি একলা কেন? সকলকেই ত নিতে এসেছে।"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"অত ছোট ছেলে নিয়ে কর্ম্ম-বাড়ীতে ছোট বউয়ের যাওয়া হ'তে পারে না। লোকটা একলা ফিরে যাবে, তুমি আজ যাও; আমি তখন কাল যাব।"

জননী যখন কথা কহিয়াছেন, তখন দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং বলিয়া ফেলিলেন, —"তোর যাওয়াই আগে দরকার—আমি আগে গিয়ে আর তা'দের কি কাজে আস্‌বো।"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, কাল সকালে আমি নিশ্চয় যাব।"

চারুশীলার অনুমতি না হইলে কি পশুপতি কোন স্থানে যাইতে পারেন? এ আবার যে সে স্থান নয়—তাহারই সতিনীর পিত্রালয়ে! পশুপতির অন্য কাজ আর কি আছে? কেবল চারুশীলার অনুমতি পাইবার জন্য এক দিনের সময় লইলেন।

জননী এখানে আসিয়া অবধি এক দিনের জন্য সুখী হইতে পারেন নাই ; সুতরাং তিনি কি এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন

তিনি পুত্রকে আর কোন কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যের সহিত কলিকাতায় রওনা হইলেন। আবার জননীর হাড়ে বাতাস লাগিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি-জননী তারাসুন্দরীর পিত্রালয়ে আসিয়া পৌঁছিলে, পশুপতির কথা সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের অপেক্ষা তারাসুন্দরী স্বামীর জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করা হইল, কিন্তু পশুপতি আসিয়া পৌঁছিলেন না। তখন পুনরায় কোন্নগরে লোক পাঠান হইল। সে লোক সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"জামাই বাবু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত এখানে আসিতে অপারক হইলেন।" সেই লোককে গোপনে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, জামাই বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চারুশীলাই তাঁহার এখানে আসিবার প্রতিবন্ধক। জামাই বাবু আসিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চারুশীলা তাঁহাকে কোন ক্রমেই আসিতে দিল না। তারাসুন্দরী অকুলপাথারে ভাসিলেন।

ভ্রাতা সন্তোষকুমারকেও গৃহে আনিবার জন্য তারাসুন্দরী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; আর বামাসুন্দরীর ভ্রাতৃশোক অপেক্ষা এ সময় ভ্রাতুষ্পুত্রের অদর্শন বিশেষ কষ্টজনক হইয়াছিল, তিনি সন্তোষকুমারের জন্যই দিবারাত্রি কাঁদিতেন। কিন্তু রামকমলের

উইলের কথা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রকাশ হওয়ায়, সন্তোষকুমা
আর গৃহে ফিরিয়া আসিল না। তারাসুন্দরী পিতৃপ্রদত্ত সম্প-
ত্তির কিছুমাত্র প্রয়াসী ছিলেন না; সুতরাং ভ্রাতা সন্তোষ-
কুমারকেই সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া, তাঁহারই অধীনে
আহ্লাদের সহিত থাকিতে পারিতেন, এবং এই সকল কথা
তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেই বলিতেন। কিন্তু সন্তোষকুমার যখন
আর গৃহে ফিরিয়া আসিল না, তখন তারাসুন্দরী এ বিষয়ে আর
কি করিতে পারেন? একে পিতৃ-বিয়োগে তারা শোকে অধীরা
তাহার উপর স্বামীর ও ভ্রাতার এরূপ ব্যবহারে তাঁহার মনের
অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে
পারে। তবে এই সময় পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা কার্য্যে ব্যস্ত
থাকায়, অনেক সময় অন্যমনস্ক থাকিতে পারিতেন।

শ্রাদ্ধাদির পর তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল, সন্তোষকুমারের
অনুসন্ধান করা। রাজেন্দ্রকুমার বসু নামক জনৈক প্রতিবাসীর
সহিত সন্তোষকুমারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন বামাসুন্দরী
তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার সন্তোষকে
আনিয়া দাও, তা নইলে আমি আত্মঘাতী হব।"

তারাসুন্দরীও একজন পরিচারিকা দ্বারা রাজেন্দ্র বাবুকে
বলিয়া পাঠাইলেন যে, পিতার উইল সত্বেও, তিনি তাঁহার দাদাকে
সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করিয়া তাঁহারই অধীনে থাকিবেন
রাজেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণকন্যাদ্বয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না;
তৎক্ষণাৎ সন্তোষকুমারের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

প্রথমে গিরিবালা নাম্নী এক বেশ্যার বাড়ী তাহার অনুসন্ধান
করিলেন, কিন্তু সেখানে সন্তোষকুমারকে দেখিতে পাইলেন না

গিরিবালা রাজেন্দ্র বাবুর বিশেষ পরিচিত, কত দিন তিনি সন্তোষকুমারের সহিত এখানে আসিয়া আমোদআহ্লাদ করিয়াছেন; কিন্তু সে আজ আর তাঁহাকে পরিচিতের ন্যায় কোনরূপ ব্যবহার করিল না। রাজেন্দ্র বাবু বড় বুদ্ধিমান ও রসিক লোক। তখন তিনি আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য গিরিবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি বিবিসাহেব, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌লে না?"

গিরিবালা তখন সুর টানিয়া টানিয়া উত্তর করিল,—"চিন্‌তে পার্‌বো না কেন গো—তবে তুমি যাকে খুঁজ্‌চো, সে সব লোককে আমি আর জায়গা দিই না।"

রাজেন্দ্র বাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"খুঁজ্‌বো আবার কাকে? খুঁজ্‌ছি তোমাকেই—তবে কি জান বিবিসাহেব, একটা কথা শুনেছি, তাই আজ এসেছি; তা কথাটা সত্যি কি মিথ্যে সেটা তো আগে জানা চাই।"

এই সময় একজন বৃদ্ধা আসিয়া কহিল—"কে ও রাজেন্দ্র বাবু না?—এস বাবা এস, বাবাকে অনেক দিন দেখিনি কেন গা?"

তাহার পর গিরিবালাকে ভর্ৎসনা করিয়া সেই বৃদ্ধা বলিল,—"গিরি, এ তোর কেমন আক্কেল লা? আলাপী ভদ্রলোক ঘরে এসেছে, তাকে বস্‌তে বলা নেই, পানতামাক খেতে দেওয়া নেই; এমন ধারা কর্‌লে কোন্ ভদ্রলোক তোর ঘরে আস্‌বে লা?"

গিরিবালা তৎক্ষণাৎ সুর পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"হাঁ মা, আমি ত জানি, রাজেন্দ্র বাবু আমাদের ঘরের লোক; তাঁকে আবার অভ্যর্থনা কি কর্‌ব?"

তাহার পর রাজেন্দ্র বাবুর উপর এক তীব্র কটাক্ষ করিয়া

গললগ্নীকৃতবাসে বিবি সাহেব আরম্ভ করিলেন,—"আস্‌তে আজ্ঞা হয়, রাজেন্দ্র বাবু! আসুন—বসুন, আজ আমার গৃহ পবিত্র হ'লো, আপনার চরণরেণুপ্রসাদে আমি আজ ধন্য হলেম।"

তখন রসিকচূড়ামণি রাজেন্দ্র বাবু গললগ্নীকৃতচাদর হইয়া করযোড়ে বলিলেন,—"বিবি সাহেব, এরূপ অপমান করা অপেক্ষা আমায় একশো জুতো গণে মার্‌লে আমি বিশেষ সৌভাগ্য ব'লে মনে কর্‌তাম।"

রাজেন্দ্র বাবুর কথার শেষ হইতে না হইতেই, গিরিবালা, রাজেন্দ্র বাবুর সেই গললগ্নীকৃতচাদর দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরিয়া, তাঁহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসাইল, এবং বৈদ্যুতিক হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আচ্ছা ভাই রাজেন্দ্র বাবু, তুমি এত দিন আস না কেন ভাই?"

আহা! এমন মধুরভাষিণী মায়াবিনী আর আছে কি গা?

রাজেন্দ্র বাবু তখন প্রবেশধিকার লাভ করিয়া আরম্ভ করিল, —"তামাক দে রে।"

অনুগত বেহারা আসিয়া তৎক্ষণাৎ রাজেন্দ্র বাবুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। সেই বৃদ্ধা আসিয়া তৎক্ষণাৎ ২।৪টা পান দিয়া গেল। রাজেন্দ্র বাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"বিবি সাহেব, বৃথা আশায় এত দিন প'ড়ে রইলে, ৪।৫ বৎসর একজন ভদ্রলোকের আশ্রয়ে রইলে, তবু আজও একখানা বাড়ী কর্‌তে পার্‌লে না।"

কথাটা, বিবিসাহেবের মনোমত হউক না হউক, সেই বৃদ্ধার বড়ই মনোমত হইল। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলিল,—"ঐ শোন্‌ গো শোন্‌, ভদ্রলোকের ছেলে কি বলে তা শোন্‌। বাবা,

বাড়ী ক’রে কাজ নেই, যা কিছু টাকাকড়ি গহনাপত্র করে-ছিলাম, তাও ঐ ছোঁড়ার পাল্লার পড়ে সব গেছে। ভাগ্গী থিয়েটার ছিল, তাই আজও পেট চল্‌ছে। ছোঁড়া হাড়ির হাল করেছে বাবা—হাড়ির হাল করেছে।”

রাজেন্দ্র একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“বল কি গো! আমরা জান্‌তুম, তোমাদের পয়সা কড়ি বেশী দিতে পারে না বটে; কিন্তু দেওয়া চুলোয় যাক্, তোমাদেরই টাকাকড়ি গহনা-পত্র পর্য্যন্ত নিয়ে খরচ করেছে!”

বিবি সাহেবের এ সকল ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করা ইচ্ছা ছিল না, সেইজন্য একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—“হাঁ, হাঁ, আজ পাঁচ বৎসর ভদ্রলোক আমার ঘরে আস্‌ছে, আর আমায় কিছু দেয় না! তোর্ ত মর্‌বার বয়েস হয়েছে, এখনও লোকের নামে মিথ্যে কথা বলিস্ কেমন করে?”

গিরিবালার কথা শুনিয়া, বৃদ্ধা বড়ই চটিয়া গেল, রাগে থর থর করিতে লাগিল। মুখ হইতে বাহির হইল,—“এখনও টান দেখেছ—আবার তাকে ডেকে আন্‌বি নাকি? এবার এলে—”

এই সময় গিরিবালা, ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে তাহারই একজন বন্ধুর সম্মুখে এরূপ কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। তখন বৃদ্ধার চৈতন্য হইল, বৃদ্ধা অমনি সে কথা চাপা দিয়া বলিল,—“তবে অধর্ম্ম কথা বল্‌তে পার্‌বো না বাবা, প্রথম প্রথম কিছু দিয়েছিল বটে; তা মায় সুদ—হাঁ কি বল্‌ছিলাম—দূর হ’ক ছাই—সব কথা আমার আবার মনে আসে না। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল নাকি?”

রাজেন্দ্র উত্তর করিল,—“সে ত বাড়ীতে যায় না তবে

কেমন ক'রে আর দেখা হবে? আচ্ছা, এখান থেকে চলে গেছে কবে?"

গিরিবালা চুপি চুপি একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আজ চার্ দিন।"

বৃদ্ধা গিরিবালার সে ক্ষুদ্র দীর্ঘ-নিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিল কি না আমরা জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"চলে গেছে—না তাড়িয়ে দিয়েছি। তাও কি সহজে পেরেছি! সেই উইলের কথা পের্কাশ হওয়া পর্য্যন্ত একমাস ধরে ঝুলোঝুলি করে, তবে গেল সোমবার তাড়াতে পেরেছি।"

গিরিবালা সেই বৃদ্ধাকে স্থানান্তর করিবার জন্ম বলিল,—"ওমা, নীচে রান্নাঘরে—আমি দুধ চাপা দিয়ে আস্‌তে ভুলে গেছি; তুই শিগ্‌গীর দ্যাখ্, নইলে বিড়ালে খাবে।"

"ওমা সেকি গো"—বলিয়া, বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেল। তখন গিরিবালা গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"আচ্ছা রাজেন্দ্র বাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌বো, আমার মাথা খাও, সত্যি কথা বল্‌বে তো?"

রাজেন্দ্র বাবু তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এ ত বাবা, তোমার আদালত নয় যে, মিথ্যা কথা বল্‌বো?"

গিরিবালা।—না মাইরি, তামাসা কর্‌ছি না।

রাজেন্দ্র।—আর আমিই কি তামাসা কর্‌ছি, তা বল, এখন আগে কথাটা কি, শুনি।

গিরিবালা।—তুমি কি সন্তোষের কাছ থেকে আস্‌ছো?

রাজেন্দ্র।—তাতেই প্রথমে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে বুঝি?

গিরিবালা।—তবে তুমি নিশ্চয় তার কাছ থেকে আস্‌ছো।

রাজেন্দ্র।—এইবার তোমার মাকে ডাক্‌বে, না একলাই মুড়ির্ঝাঁটার বন্দোবস্ত কর্‌বে?

গিরিবালা।—না ভাই, সত্যি কথা বল্‌না।

রাজেন্দ্র।—বাস্তবিক আমি সন্তোষের কাছ থেকে আস্‌ছিনে, তবে অন্য একজনের কাছ থেকে আস্‌ছি বটে।

গিরিবালা।—মাইরি, মাথা খাও কার কাছ থেকে বল্‌না।

রাজেন্দ্র।—যে বাবা কবে মর্‌বে বলে টেঁকে বসে থাকে না, নিজে রোজগার করে, আর নিজে অকাতরে খরচ করে।

গিরিবালা।—মাসে কত টাকা মাইনা দেবে?

রাজেন্দ্র।—আমি কায়েতের ছেলে, আমি ত আর একাজের দালাল নই বাবা। সে বন্ধুলোক, তোমার ঘরে আস্‌তে চায়; তোমার সঙ্গেও আমার আলাপ আছে, তাই জান্‌তে এসেছি।

রাজেন্দ্রের মন বলিতেছে,—"যেজন্য আসা বাবা, সে কাজের ত কিছুই হল না, এখন একটা দম্ দিয়ে পালাতে পার্‌লে বাঁচি। আর আমার প্রণয়-পরীক্ষায় দরকার নেই বাবা!"

গিরিবালা।—সে লোক দেখ্‌তে কেমন—তার বয়স কত হবে?

রাজেন্দ্র।—দেখতে কেমন—এলেই দেখতে পাবে; বয়সের জন্য তাকে নয় তার ঠিকুজী-কুষ্ঠি আন্‌তে বল্‌বো। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও বাবা। দিন কতক থিয়েটারে গিয়ে তোমার মতিগতি সব ফিরে গেছে দেখছি যে! এখন একটি ছোট্‌কথা বল; তাকে আন্‌বো কি না?

গিরিবালা অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"এসো।"

"তবে আজ আসি"—এই কথা বলিয়া, রাজেন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর জুতা পায়ে দিতে দিতে বলিলেন,—"আর সন্তোষের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাকে কোন কথা বল্‌বো কি?"

গিরিবালা তৎক্ষণাৎ রাজেন্দ্রকুমারের কোঁচা ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার মাথা খাও, আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও।"

রাজেন্দ্র সেইরূপ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিলেন,—"আমি তোমার মাথাও খেতে পার্‌বো না, আর তোমার তামাকও খেতে পার্‌বো না। আমার একটা বিশেষ দরকার আছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সুতরাং আর বস্‌বো না। যদি কোন কথা থাকে ত বল।"

গিরিবালা তখন বিশেষ মিনতি করিয়া বলিল,—"তাকে অতি অবিশ্যি আস্‌তে বলিও। কিন্তু মা যেন টের পায় না।"

রাজেন্দ্রকুমার আর সে স্থলে রহিলেন না। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন,—"এ নূতন রকমের প্রণয় বটে! দু'জনকেই আস্‌তে বল্‌বো, তবে একজন প্রকাশ্যে, আর একজন গোপনে!"

রাজেন্দ্রকুমার রাস্তায় আসিয়াই কি জানি কেন দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

দৌড়িতে দৌড়িতে তিনি থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন, কিন্তু সেখানেও সন্তোষকুমারের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়, ঐ থিয়েটারের এক জন বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সন্তোষ বাবু আজ তিন দিন থিয়েটারের সন্নিকটস্থ একটা কুপল্লীর খোলার ঘরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। তিনি আরও অনু-সন্ধানে জানিলেন যে, সেই বাড়ীতে এই থিয়েটারের কয়েক জন হতভাগার একটা আডডা আছে; তাহারা সেই আডডায় তাহা-দের অনেক কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে! ইহা ব্যতীত সেই বাড়ীতে কতকগুলি নীচ-শ্রেণীর বেশ্যাও বাস করিয়া থাকে।

রাজেন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ সেই আড্ডার উদ্দেশে চলিলেন। নিকটে গিয়াই, একটা কোলাহল শুনিতে পাইলেন; সেই কোলাহলের মধ্যেই সন্তোষকুমারের পরিচিত স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই, প্রথমেই সন্তোষকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তিনি সন্তোষকুমারের তৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া বড় ভীত হইলেন। সন্তোষকুমার তাঁহাকে দেখিয়া একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীগণও মহোল্লাসে সেই হাস্যের সহিত যোগ দিল। সে কি হাস্যধ্বনি, না বজ্রনাদ? রাজেন্দ্রকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি সন্তোষকুমারকে অনেকবার মদ্যপান করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এমন ভয়ানক মূর্ত্তি কখন দেখেন নাই। সঙ্গী ও

সঙ্গিনীগণের মূর্ত্তিও ভীতিজনক—দুইটা নীচশ্রেণীর বেশ্যাও সেই দলে ছিল। তাহাদিগকে দেখিলে, প্রেতযোনি ভিন্ন এ পৃথিবীর লোক বলিয়া মনে হয় না। পিশাচ ও পিশাচিনীগণ, বিকট হাস্যের সহিত লম্ফঝম্ফ করিয়া রাজেন্দ্রকুমারকে অভ্যর্থনা করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই রাজেন্দ্রকুমারের পরিচিত, সেই কারণে তাঁহার অভ্যর্থনার একটা ধূম পড়িয়া গেল। একজন ঘোর নারকীও হঠাৎ এরূপ দৃশ্য দেখিলে স্তম্ভিত হয়; সুতরাং রাজেন্দ্রকুমার অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! সন্তোষকুমারকে এরূপ অবস্থায় এরূপ পৈশাচিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত জানিলে, তিনি কখনই এস্থানে আসিতে সাহসী হইতেন না।

রাজেন্দ্রকুমার অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহাদের দলে মিশিলেন, এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে অপেক্ষা করা বৃথা হইতে লাগিল, সন্তোষকুমার ক্রমে নানা-প্রকার উৎপাৎ আরম্ভ করিল; কখন উন্মাদের ন্যায় বিকট হাস্যের সহিত নৃত্য করে, কখন বা বিকট চীৎকারের সহিত সুরলয়-বিহীন গান করে। এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নহে, সুতরাং রাজেন্দ্রকুমারের উদ্দেশ্য কিরূপে সফল হইতে পারে? তথাপি তিনি কেবল দুইজন ব্রাহ্মণ-কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য, এই সকল নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সন্তোষকুমারের সঙ্গী ও সঙ্গিণীগণ সকলেই যখন ক্লান্ত বা অচৈতন্য হইয়া পড়িল, তখন রাজেন্দ্রকুমার সুযোগ পাইলেন। সন্তোষকে একাকী পাইয়া আরম্ভ

করিলেন,—"বলি ভায়া, আর কেন? এখন স্নানাহার কর্‌লে ভাল হয় না কি?"

সন্তোষ উত্তর করিল,—"এ প্রাণ থাকৃতে আর স্নানাহার করবো না, বাবা। স্নানাহার অনেক করেছি—আর কেন?"

রাজেন্দ্র।—তবে এখন কি কর্‌বে?

সন্তোষ।—এই যা কর্‌ছি, তাই কর্‌বো। তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেছে বাবা, দেখি আরও ক'দিন ক'রাত্রি কাটে।

রাজেন্দ্র।—আর বেশী দিন যে কাট্‌বে না, সে কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। তবে বল্‌ছিলাম কি, এ রকম করে প্রাণটা নষ্ট কর্‌বার দরকার কি?

সন্তোষ।—তোকে তবে প্রাণের কথা বলি—এখন এ প্রাণের বড় জ্বালা বাবা! এ পৃথিবীতে আর কি সুখ আছে বাবা—যার আশায় আমি আমার প্রাণের সেই বিষম জ্বালা সহ্য কর্‌বো?

রাজেন্দ্র।—তাই বলে কি প্রাণটা এইরকম করে নষ্ট কর্‌বে?

সন্তোষ এইবার হাত নাড়িয়া, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুরে আরম্ভ করিল—"প্রাণ নষ্ট কর্‌ছি না বাবা, কেবল প্রাণের জ্বালা নষ্ট কর্‌ছি। মদ খেয়ে এই রকম করে হৈ হৈ কর্‌লে আমি প্রাণের জ্বালা ভুলে যাই—আমি তাই মদ খাই। প্রাণের জ্বালা ভুল্‌বার এমন ওষুধ আর নাই বাবা! আমার অনেক কথা মনে পড়ছে—আবার একটু খেতে হ'লো বাবা।"

এই কথা বলিয়া, সন্তোষকুমার, তাড়াতাড়ি একটা গ্লাসে সুরা ঢালিয়া,মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই পূর্ণ গ্লাস শূন্য করিয়া ফেলিল। রাজেন্দ্রকুমার কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার পর

বলিলেন,—"দেখ সন্তোষ, আর মদ খাস্‌নে। তোর প্রাণের জ্বালা নিবারণ কর্‌বার উপায় আমি করেছি. তাই তোকে বল্‌বার জন্যই এখান পর্য্যন্ত এসেছি।"

সন্তোষ, কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"কি উপায় বাবা?"

রাজেন্দ্রকুমার এইবার ধীরে ধীরে প্রস্তাব করিলেন,—"তুমি বাড়ী চল। তোমার ভগ্নী সমস্ত বিষয় তোমার হাতে দেবে, আর তোমারই অধীন হয়ে থাক্‌বে।"

সন্তোষ, উন্মাদের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি আমার ভগ্নীর অনুগ্রহ চাই না।"

রাজেন্দ্রকুমার পুনরায় ধীরভাবে বলিলেন,—"অনুগ্রহ কেন—বিষয় ত তোমারই। তুমি থাক্‌তে তোমার ভগ্নী কে?"

পুনরায় একটা বিকট হুঙ্কারের সহিত চীৎকার হইল,—"এখন আমি যে বাবার তেজ্য পুত্র!"

রাজেন্দ্রকুমার একবার সন্তোষের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মূর্ত্তিমান প্রতিহিংসা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আর একবার প্রস্তাব করিলেন,—"তোমার ভগ্নী যদি তোমায় দানপত্র লিখিয়া দেয়।"

তৎক্ষণাৎ সেইরূপ উন্মত্তস্বরে উত্তর হইল;—"আমি সে দানে প্রস্রাব করে দিই।"

রাজেন্দ্রকুমার তখন বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"তবে আর আমি উপায় কি কর্‌বো?"

সন্তোষ, এইবার একটা বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"উপায়

আর কাকেও কর্‌তে হবে না, আমি নিজেই কর্‌বো! এই স্বহস্তে তাকে খুন কর্‌লেই আমার এ প্রাণের কষ্ট যাবে।”

রাজেন্দ্রকুমার এইবার ভীত হইলেন। সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির এরূপ ভয়ঙ্কর প্রস্তাব শুনিলে, কেনা ভীত হয়? তুচ্ছ বিষয়ের জন্য, মানুষ কি এত নীচ হইয়া যাইতে পারে? সন্তোষকুমার না তাহার ভগিনী তারাসুন্দরীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত? ছোট ভগিনীর প্রতি বড় ভাইয়ের সে স্নেহ ও ভালবাসা তবে কোথায় গেল? রাজেন্দ্রকুমার অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। এইবার প্রস্তাব করিলেন,—“আচ্ছা, বাড়ী না যাও, গিরি-বালার ঘরে চল। সে তোমার জন্য এখন অস্থির হয়েছে।”

পুনরায় একটা বিকট হাস্যের সহিত সন্তোষ উত্তর করিল, —“তাকে অস্থির হতে বারণ ক’রো আমি সেখানেও যাব। কিন্তু আগে তারাকে খুন কর্‌বো, তার পর গিরিবালার পালা! সেই সঙ্কল্প করেই এই যজ্ঞ আরম্ভ করেছি—তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল, এখনও পূর্ণাহুতি দিতে পারি-নি; যেদিন পূর্ণাহুতি দেব, সেদিন ঘরেও যাব, আর গিরিবালার সঙ্গেও দেখা কর্‌বো। এই দেখ—বলির অস্ত্র।”

উন্মত্তভাবে দৌড়িয়া গিয়া, সন্তোষ, কোথা হইতে একখানা তীক্ষ্ণ নূতন অস্ত্র আনিয়া বাহির করিল। সে অস্ত্র দেখিয়া, রাজেন্দ্রকুমারের প্রাণ উড়িয়া গেল। রাজেন্দ্রকুমার ঊর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী ও তাহার পিসিমাতা, রাজেন্দ্রকুমারের মুখে সন্তোষকুমারের সকল কথাই শুনিলেন। পিসিমা তখন কাঁদিয়া কাটিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় তারাসুন্দরী এখন পিসিমাতারও চক্ষুশূল হইল। সুতরাং তারাসুন্দরী অকুল পাথারে পড়িল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, তারাসুন্দরীর অপরাধ কি? প্রথমতঃ তারা-যখন শ্বশুরালয়ে থাকিত, তখন এমন কোন অপরাধ করে নাই যে, তাহার জন্য শাশুড়ীর নিকট সেরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা খায়। তবে কি, শাশুড়ীকে সন্তোষ করিবার জন্য—আপনার হৃদয়কে বলি দিয়া, সে যে স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাতেই কি তাহার অপরাধ হইয়াছে? ইহাকে যদি অপরাধ বলে, তবে আত্মবিসর্জ্জন কাহাকে বলিব? আমরা অপরাধ খুঁজিয়া পাই না বটে, কিন্তু তারাসুন্দরীর শাস্তির দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। তারাসুন্দরীর প্রথম শাস্তি হইল—স্বামী-সুখে বঞ্চিত। যে ভিত্তির উপর তারার জীবন নির্ভর করিতেছে, এইবার সেই ভিত্তি খসিল। কেন?—কোন্ অপরাধে? তাহার পর, শাশুড়ীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা,—অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, গুরু-লোকের সে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা বরং সহ্য হইতে পারে, কিন্তু বিনা অপরাধে তাহা অপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিতাকারে তাহার উপরে সতিনীর সেই ভীষণ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরম্ভ হইল কেন? আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি—কোন্ পাপের এ গুরু দণ্ড? সতিনীকে আপনার সহোদরা ভগিনী অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত বলিয়াই

কি, তারাসুন্দরীর এই দণ্ড হইল? এইত গেল তারার শ্বশুরালয়ের ব্যাপার!

তাহার পর, শ্বশুরালয় হইতে কিরূপ অবস্থায় তারাসুন্দরী পিত্রালয়ে আসিল, তাহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পিত্রালয়ে আসিয়া তারার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সে জীবন কি রক্ষা হইল এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য? তারাকে যন্ত্রণা দিয়া, সেই যন্ত্রণাদাতার কি এখনও আশা মিটে নাই? এ যন্ত্রণার প্রকরণটাও মন্দ নহে। অনাথিনীকে অতুল ধনের অধিকারিণী করিয়া এরূপভাবে অসুখী করা, যন্ত্রণার একটা নূতন সৃষ্টি বটে! আমরা সেইজন্যইত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না যে, তারাসুন্দরীর অপরাধটা কি? তারাসুন্দরীর এই সকল যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়া, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখিবার জন্য, আমরা কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। তারাসুন্দরীর অদৃষ্টে যদি—আর না। সেই অকুলের কাণ্ডারীর কৃপায় আমরা এইবার কুল পাইয়াছি। এই অদৃষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াই আমরা এতক্ষণ গোলে পড়িয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম তারাসুন্দরীর অদৃষ্টে সুখ নাই, সুতরাং তাহাকে সুখী করিবে কে? যাহা হউক, তারাসুন্দরীর অদৃষ্টে এখন আরও কিছু বাকি আছে কি?

তারাসুন্দরী আর কি করিবে? কেবল নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিত। স্বামী তাহাকে এই বয়সে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিল, বিনা অপরাধে সে ভ্রাতৃ-স্নেহেও বঞ্চিতা হইল। ভ্রাতাকে সমস্ত বিষয় দান করিয়া তারা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও প্রস্তুত, তথাপি ভ্রাতা গৃহে

ফিরিয়া আসিল না। ভ্রাতার সম্বন্ধে সে আর কি করিতে পারে? সতিনীকে স্বামীদান করিয়া তারা দাসীর ন্যায় তাহাদের উভয়ের সেবা করিতে প্রস্তুত; তথাপি তাহারা তারাকে চায় না। সতিনী-সম্বন্ধেও তারা আর কি করিতে পারে? তারার যদি কোন বন্ধু থাক, তবে বলিয়া দাও, সতিনী আর ভ্রাতাকে সন্তোষ করিবার জন্য, তাহাকে আর কি স্বার্থ-ত্যাগ করিতে হইবে? মৃত্যুর জন্যও তারা অনেক দেবতার উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু কৈ? সে উপাসনারও কোন ফল হয় নাই। আর যদি বল—আত্মহত্যা! সে কথা মনে হইলে তারার শরীর শিহরিয়া উঠে। তারার সে প্রকৃতি নহে—তারা আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু স্বহস্তে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়, তারা আপনার শয্যায় শুইয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া গৃহের অন্ধকার নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নালোকে গৃহের সমস্ত দ্রব্যই একপ্রকার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তাহার পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে কত কথাই মনে হইতেছে। তারা আপন মনে চিন্তা করিতেছিল, কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না, এমন সময় গৃহের মধ্যে হঠাৎ একটী শব্দ শুনিয়া তারার দৃষ্টি সেই দিকে গেল। তারা দেখিল, জানালার গরাদে খুলিয়া কে একজন ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। প্রথমে তারা তাহাকে ঐরূপভাবে আসিতে দেখিয়া ভীত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার আর সে ভয় রহিল না। জ্যোৎস্নালোকে তারা দেখিল, সে ব্যক্তি অন্য কেহ নহে—তাহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষকুমার। পূর্ব্বে পিতার ভয়ে অনেক রাত্রি তারা

ভ্রাতাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়াছিল, সেই কারণ আজ বহুদিনের পর ভ্রাতাকে পাইয়া তারার হৃদয়ে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু একি! আজ তাহার ভ্রাতার হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র কেন? তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদাকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার হস্তে অস্ত্র দেখিয়া তারা উঠিতে পারিল না। তারা সভয়ে দেখিল, তাহার ভ্রাতা সন্তোষকুমার বিকট মূর্ত্তিতে কম্পিত হস্তে সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া তাহার শয্যার নিকট ধীরে ধীরে আসিতেছে; কিন্তু তারার তখন বাক্‌শক্তি ছিল না, সুতরাং তারা কোনরূপ চীৎকার করিতে পারিল না। তাহার পর যখন সন্তোষ বামহস্তে তাহার মশারি উঠাইয়া ডানহস্তে সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র তুলিল, তখন তারা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দাদা, তুমি আমায় খুন—"

কথা শেষহইতেই না হইতেই, দাদার হস্তস্থিত সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে ভগিনীর হৃদয়ে আঘাত করিল! একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষ এক লম্ফে সেই জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তারার অদৃষ্টে এত ছিল!

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্তোষকুমার সে স্থান হইতে দৌড়িয়া রাস্তায় আসিল। রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং রাস্তা প্রায় নির্জ্জন। সন্তোষ সেই নির্জ্জন রাস্তা প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিল। সে অস্ত্রখানা এখনও তাহার হস্তেই ছিল, কারণ তাহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এরূপ গভীর রাত্রে

কলিকাতার রাস্তা যে প্রহরীশূন্য ছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না ; তবে একজন খুন করিয়া এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া দৌড়িয়া চলিয়াছে, অথচ কোন প্রহরী কর্তৃক যে ধৃত হইল না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের বোধ হয়, সন্তোষ এই সকল স্থানের প্রহরিগণের বিশেষ পরিচিত ছিল, এবং তাহাকে রাত্রে প্রায়ই তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিত, সেই কারণ এরূপ ভয়ানক ঘটনার বিষয় তাহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। সে যাহা হউক, সন্তোষের সেই ভীষণ মূর্ত্তি শেষে গিরিবালার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বাড়ীর সদর দরজা তখনও খোলা ছিল; বেশ্যাদিগের সদর দরজা গভীর রাত্রেও প্রায় খোলা থাকে। সন্তোষ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে বাড়ীর নিম্নতল বড়ই অন্ধকারময় ; কিন্তু সে সকল স্থান সন্তোষের বিশেষ পরিচিত, সুতরাং সে অন্ধকারে সন্তোষের গতি রোধ করিতে পারিল না। সন্তোষ দ্রুতবেগে উপরে উঠিল। গিরিবালার জন্য তাহাকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না। সন্তোষ উপরে উঠিয়াই বারন্দায় দেখিল, সেই জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে ডুবিয়া, গিরিবালা গভীর নিদ্রায় অভিভূতা। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র হঠাৎ সম্মুখে শিকার দেখিতে পাইলে যেরূপভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, সন্তোষ সেইভাবে তীক্ষ্ণঅস্ত্রহস্তে গিরিবালার উপর লাফাইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ একটা চীৎকার উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের নদীও বহিল। সেই চীৎকারে বাড়ীর অন্যান্য সকলে জাগরিত হইয়া ভীষণ কোলাহল তুলিল। সেই কোলাহলের মধ্যে 'সন্তোষ', 'গিরিবালা' ও 'খুন' এই তিনটী কথা মাত্র স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল।

সন্তোষ সেই কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তখনও একটা পৈশাচিক হাসি হাসিতেছিল; হঠাৎ ধৃত হইবার ভয় তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিল। এইবার সে পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু তখন তাহার সে চেষ্টা করা বৃথা। তখন প্রতিবাসিগণ ও পুলিষের লোকে পর্য্যন্ত বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্তোষ একটা পার্শ্বের ঘরে দৌড়িয়া প্রবেশ করিল। সে ঘরে তখন অন্য কেহ ছিল না; ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সন্তোষ সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু দরজা যে কেবল ভিতর হইতে বন্ধ হইল, তাহা নহে। এই সময় একজন কন্‌ষ্টেবল—যে এতক্ষণ নীচে দাঁড়াইয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছিল, এইবার সাহসে ভর করিয়া মহা আস্ফালনের সহিত দৌড়িয়া আসিয়া দরজা বাহির হইতেও বন্ধ করিয়া দিল; সুতরাং ব্যাঘ্র জালে পড়িল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সন্তোষ আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল। তখনও সেই রক্তমাখা অস্ত্রখানা তাহার মুষ্টিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান দিল না। দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্ট্যাবদ্ধ অস্ত্র ভীষণবেগে তাহার সেই পাষাণ হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিল। তখনও বাহিরে সেই কোলাহল—গৃহের মধ্যে পুনরায় এ ভীষণ ব্যাপারের বিষয় কেহ তখন জানিতে পারে নাই। কারণ তখন গিরিবালাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, কিন্তু সে বন্দোবস্ত হইতে হইতেই গিরিবালার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। এখন খুনী আসামী ধৃত হইয়াছে, সুতরাং পুলিষের আনন্দের সীমা ছিল না। পুলিষ

যখন মহোল্লাসে লাশের চারিদিকে ঘেরিয়া অন্যান্য লোকের প্রতি অতি ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছিল, এমন সময় সন্তোষ যে গৃহে আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহের নর্দ্দামা দিয়া একটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে আসিয়া গিরিবালার রক্তনদীর সহিত মিশিল। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র ধারা যখন ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইল, তখন জমাদার সাহেবের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিল। তিনি সেই স্থানে আলো লইয়া দেখিয়া হুকুম দিলেন,—"জলদি কেওয়াড়ি তোড়।"

তখনও উপরওয়ালার আসিবার অবসর হয় নাই, সুতরাং জমাদার সাহেবের হুকুম তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। আট দশবার পদাঘাত করিবামাত্র সে দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তখনও সে গৃহে প্রবেশ করিতে জমাদার সাহেবের সাহস হয় নাই, তিনি পুনরায় হুকুমের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিলেন। চারি-জন কনষ্টেবল ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আলো-হস্তে দরজার সম্মুখে ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। কিন্তু সেই বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহারা গৃহের ভিতরে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতেই এতদূর ভীত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের সেই হস্তস্থিত আলো ভূতলে পড়িয়া গেল। এই সময় ২।৩ জন পুলিষের ইংরাজ-কর্ম্মচারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পুনরায় তাড়াতাড়ি আলো লইয়া, এইবার জমাদার সাহেব স্বয়ং সাহেবদিগকে প্রথমে গিরিবালার মৃতদেহ দেখাইল, তাহার পর অন্য কোন কথা না বলিয়া সেই আলো সন্তোষের দিকে ফিরাইয়া ধরিল। একজন সাহেব সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"double murder!"

তখন সেই গৃহের মধ্যে সাহেবগণ দৌড়িয়া গেলেন। অন্-

ক্ষণ সে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া পুলিষের বড় সাহেব বলিলেন,—"that s murder and this is suicide !"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারুশীলার আজ আনন্দের সীমা নাই। এত যে সাংসারিক কষ্ট; রাত্রিদিন কলহবিবাদে এত যে জ্বালাতন হইত, আজ চারুশীলা সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে। এ আনন্দের কারণ—চারুশীলা সংবাদ পাইয়াছে যে, তারাসুন্দরী তাহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক খুন হইয়াছে। একেত সতিনীর মৃত্যুসংবাদ—তাহায় উপর আবার স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, আপনার ভ্রাতা কর্ত্তৃক খুন! চারুশীলা আনন্দে একেবারে অধীর! এমন সময় বিশ্বেশ্বরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারুশীলার সহিত বিশ্বেশ্বরীর পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব ছিল না; কিন্তু এরূপ আনন্দের সংবাদ চারুশীলা বিশ্বেশ্বরীকে না দিয়া কি থাকিতে পারে? সুতরাং চারুশীলা ডাকিল,—"পিসিমা।"

আহা! চারুশীলার কণ্ঠস্বর আজ কি মধুর! অনেক দিনের পর সেই মধুর সম্ভাষণের উত্তরে পিসিমাও মধুরতর প্রত্যুত্তর করিল,—"কেন মা?" তখন চারুশীলা বলিল—"ঘটনাটা শুনেছ কি?" বিশ্বেশ্বরী আর থাকিতে পারিল না; ধ্বংশাবশিষ্ট দুই একটি দন্ত আমূল বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"শুনেছি।"

চারুশীলা।—তবে সত্যি?

বিশ্বেশ্বরী।—তোর বুঝি একথা বিশ্বাস হয় না! তা বিশ্বাস

না হয়, সেখান থেকে যে লোক পশুপতিকে নিতে এসেছে, তাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না?

চারুশীলা।—সেখান থেকে লোক এসেছে নাকি?

বিশ্বেশ্বরী।—হাঁ—তারই কাছে ত আমি সব কথা শুনলেম।

চারুশীলা।—তা শ্রাদ্ধ কবে হবে? এবার আমি এ শ্রাদ্ধ খেতে যাব। আচ্ছা পিসিমা, খুন হলে তার আবার শ্রাদ্ধ হয় নাকি?

বিশ্বেশ্বরী।—এখনও ত মরে নাই, তুই এরই মধ্যে শ্রাদ্ধ খাবার জন্য পাগল হলি যে?

চারুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কি! এখনও মরেনি!"

চারুশীলার মনে হইতে লাগিল যে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ঘটনা আর পৃথিবীতে নাই। চারুশীলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে যে ভাই ছুরি মেরে খুন করেছে শুনলেম্।"

বিশ্বেশ্বরী।—ছুরি মেরেছিল বটে, কিন্তু খুন হয়নি—এ যাত্রা বেঁচে গেছে।

চারুশীলা।—তবে কি খুনের কথা সব মিথ্যে?

বিশ্বেশ্বরী।—খুনের কথা মিথ্যে নয়—খুন করেছে একটা বেশ্যাকে, আর নিজের বুকে ছুরি মেরে খুন হয়েছে।

চারুশীলা।—বেশ্যাকে খুন করলে—নিজে খুন হলো, আর বোনটাকে খুন করতে পারলে না?

বিশ্বেশ্বরী এবার, চারিদিক চাহিয়া, চুপিচুপি বলিল,—"সে আমাদেরই অদেষ্ট মা।"

চারুশীলা আপনার অদৃষ্টকে মনে মনে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বরী বলিল,—"তবে এখনো বলা

যায় না, যে জ্বর হয়েছে, তাতেই ভাল-মন্দ হয়ে যেতে পারে।"

চারুশীলায় তখন অদৃষ্টের উপর বড়ই রাগ, সুতরাং বলিল,—"পোড়া অদেষ্ট কি তেমন।"

বিশ্বেশ্বরী।—তোর অদেষ্টে আবার কি হয়, দ্যাখ—পশুপতি ত আজই চল্‌লো। তারপর সেখানে তোর হাড়জ্বালানি শাশুড়ি আর সেই বিধু-ঝিও রয়েছে; আমার বড় ভয় করে মা—সে খপ্পরে পড়লে কি আর তোর কথা মনে থাক্‌বে? যদি বেঁচে ওঠে, তবে তার রূপ থাকুক আর নাই থাকুক, ওর ঐশ্বর্য্য দেখেই তোরে ভুলে যাবে।

চারুশীলা।—তবে উপায়?

বিশ্বেশ্বরী।—সত্যি কথা বল্‌তে কি মা; পশুপতির এখন যে ভাবগতিক দাঁড়িয়েছে, তাতে বড়র দিকেই যেন বেশি টান। কেবল তোমার ভয়ে সে কথা মা, এতদিন আমি পেরকাশ করিনি।

চারুশীলা।—আমিও কি সে কথা জান্‌তে পারি-নি পিসিমা? আমিও সেকথা জেনেছি। তা এর কি কোন উপায় নাই?

বিশ্বেশ্বরী।—উপায় থাক্‌বে না কেন? তা মা; তুমি এখন আর সে ছোটবউ নেই ত, যে আমার কথায় মর্‌বে আর বাঁচ্‌বে। আমি যেন এখন তোর শত্রু হয়েছি; তা নইলে এতদিন কোন্ কালে আমি এর উপায় কর্‌তেম।

চারুশীলা এবার মিনতি করিয়া বলিল,—"দেখ পিসিমা; সংসারে বড় টানাটানি ব'লে আমার সব সময় মেজাজ ঠিক্

থাকে না। তাই মধ্যে মধ্যে আমি তোমাকেও দু'কথা বলি। তুমি ভিন্ন আমার আর দরদের কে আছে পিসিমা ?"

শেষের কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, চারুশীলার চক্ষু দুইটি ছলছল করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী বহুরূপী, আপনার মায়াজালে শিকারকে আবদ্ধ করিয়া, তখন মোহিনীমূর্ত্তি ধরিল। চারুশীলার সেই ছলছল চক্ষু দেখিয়া তাহারও চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। স্নেহ যেন অশ্রুমূর্ত্তি ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। বিশ্বেশ্বরী সস্নেহ মধুমাখা স্বরে বলিল, —"হাঁ মা, আমি কি নিশ্চিন্ত আছি মা ? আমার কি তোর জন্যে প্রাণ কাঁদে না ? তোর অত বুদ্ধি থাক্‌লে, তুই কি না আমার সঙ্গে ঝগড়া করিস্ ?"

চারুশীলার চরিত্র যতই মন্দ হউক না কেন, বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রের নিকট সে অবনতমস্তক। চারুশীলা এইবার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বিশ্বেশ্বরী আপনার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"কাঁদিস্‌না মা, কাঁদিস্ না। এক কর্ম্ম কর; আমি এই শিকড়টি দিচ্ছি, তুই পানের সঙ্গে পশুপতিকে আজই খাইয়ে দে। তা হলেই সে তোর খুব বশ হবে—বড় বউকে বিষনয়নে দেখ্‌বে। তার ঐশ্বর্য্য দেখেও তোকে ভুলে যাবে না। এখন অষুধ না কর্‌লে কি আর তাকে বশে রাখ্‌তে পার্‌বি ?"

চারুশীলা যেন অকূল সাগরের কূল পাইল। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে গোপনে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। এমন সময় পশুপতি চারুশীলাকে ডাকিলেন। চারুশীলা তখন পশুপতির জন্য অধীর, সুতরাং দৌড়িয়া পশুপতির নিকট গেল।

বিশ্বেশ্বরী, একবার চারিদিক চাহিয়া তাহার পর এক ভয়ঙ্করী সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল,—"এইবার আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বরীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। সেই দিনই পানের সহিত চারুশীলা পশুপতিকে তাহার প্রদত্ত শিকড় খাওয়াইয়া দিল। পশুপতি তারাসুন্দরীকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিলে, চারুশীলা নানা প্রকার আপত্তি করিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, সে সকল আপত্তির কোন ফলই হইল না; তখন পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার জন্য চারুশীলা স্বামী বশীভূত করিবার ঔষধ পশুপতিকে তৎক্ষণাৎ সেবন করাইতে বাধ্য হইল। পানের মধ্যে যে এরূপ কোন ঔষধ ছিল, পশুপতি তাহা জানিতে পারেন নাই, এবং তখন কোনরূপ সন্দেহও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। পান চিবাইতে চিবাইতে পশুপতির বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, এবং তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। পশুপতি তখন শরীর অসুস্থ বলিয়া শয্যায় শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং এবারও যে লোক পশুপতিকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, সে লোককেও শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া পশুপতি বিদায় করিয়া দিলেন। চারুশীলা ঔষধের এরূপ প্রত্যক্ষ গুণ দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিতা হইল, এবং মনে মনে বিশ্বেশ্বরীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

বাস্তবিক পশুপতির শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়াছিল। হঠাৎ

ঐরূপ অসুস্থ হইবার কারণ পশুপতি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিন চারি ঘণ্টা পশুপতি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। পশুপতি তখন তাঁহার মাথার ভিতর এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ স্বচক্ষে দেখিয়া, চারুশীলা আজি মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং সে আর পশুপতির সংবাদ লইবে কেন? সন্ধ্যার সময় যখন প্রদীপহস্তে চারুশীলা সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন পশুপতি ত এক প্রকার জ্ঞানশূন্য! হঠাৎ তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু আর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি দেখিয়া চারুশীলা প্রথমেই ভীত হইল, তাহার পর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া চারুশীলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার চোখ্ এত রাঙা কেন?"

পশুপতি স্থিরদৃষ্টিতে চারুশীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না। চারুশীলা পশুপতির গাত্রস্পর্শ করিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে গাত্র এত উষ্ণ যে, চারুশীলা অধিকক্ষণ স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারিল না। চারু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি জ্বর হ'য়েছে?"

এবারও পশুপতি কোন উত্তর করিলেন না; সেইরূপ স্থিরদৃষ্টিতে চারুশীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পশুপতি কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কথা কহিতে তখন তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। পশুপতি কেবল আপনার মস্তক দেখাইয়া দিলেন—মস্তকের যন্ত্রণার বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। আর কিছুক্ষণ পরে পশুপতি মস্তকের যন্ত্রণায় এতদূর অস্থির হইলেন যে, আর স্থির হইয়া শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। পশুপতি দৌড়িয়া গৃহের বাহিরে

আসিলেন। চারুশীলাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। পশুপতি যে অসুস্থ চারু তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই বশীকরণ ঔষধই যে এই অসুস্থতার কারণ, এখনও সেকথা চারুশীলার মনে উদয় হয় নাই। পশুপতিকে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, চারুশীলা গিয়া তাঁহাকে ধরিল; কিন্তু পশুপতি এরূপ উন্মত্ত যে, চারু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পশুপতি চারুশীলাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। তখন অন্ধকার হইয়াছিল; সুতরাং চারুশীলা পুনরায় উঠিয়া পশুপতিকে ধরিবার উপক্রম করিলে, পশুপতি অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এইবার চারুশীলার, বিশ্বেশ্বরীর ঔষধের উপর সন্দেহ হইল; কিন্তু বিশ্বেশ্বরী তখন সে বাড়ীতে ছিল না, সেই কারণে তাহাকে কোন কথা চারুশীলার জিজ্ঞাসা করা হইল না।

এখন বিশ্বেশ্বরীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বেশ্বরী আর এ বাড়ীতে থাকিবে কেন? বিশ্বেশ্বরীর অনুপস্থিতে চারু-শীলার সে সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং চারুশীলা পশুপতির জন্য বিশেষ ভাবিত হইল। পশুপতির অবস্থার পরিবর্ত্তনের দরুণ এখন আর বাড়ীতে কোন দাসদাসী ছিল না, সুতরাং চারুশীলা কাহাকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইবে? অনেক চিন্তার পর একজন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া, চারুশীলা এই কার্য্যের ভার দিল। কিন্তু সে রাত্রি দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, পশুপতির কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। চারুশীলা তখন উপায় না দেখিয়া, আপনার পিত্রালয়ে সেই লোকের দ্বারা সংবাদ পাঠাইল। চারুশীলার

এক ভ্রাতা, তিন চারি জন আত্মীয়বন্ধুর সহিত সমস্ত রাত্রি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, অতি প্রত্যুষে পশুপতিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু এ পশুপতি কি এখন আর সে পশুপতি আছেন? যেরূপভাবে তাঁহাকে ৩।৪ জন লোকে ধরিয়া বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহা দেখিয়াই চারুশীলার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল! তাহার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, এখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। তবে কি পশুপতি যথার্থই উন্মাদ হইয়াছেন? পশুপতির কার্য্য দেখিলেই এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশুপতির প্রথম কার্য্য হইল—উচ্চহাস্য! হো-হো-হো—সে হাসি আর থামে না। গতকল্য সন্ধ্যার সময় পশুপতি যখন মস্তকের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন পশুপতির বরং কতক জ্ঞান ছিল; কিন্তু এখন আর পশুপতির সে জ্ঞানটুকুও নাই। সঙ্গীগণের প্রথম কার্য্য হইল, পশুপতিকে স্নান করান। চারুশীলাকে শীঘ্র তৈল আনিতে বলা হইল। চারুশীলা তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার পুরস্কার হইল—সজোরে পদাঘাত! দূরে তৈলের বাটি পড়িয়া গেল, চারুশীলাও পড়িয়া গিয়া এবার মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইল।

বিশ্বেশ্বরীর বশীকরণ ঔষধের ফল শেষে কি এই দাঁড়াইল? চারুশীলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার আরম্ভ হইল। তাহার মস্তকের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা হৃদয়ের আঘাতের যন্ত্রণা তখন অধিক বোধ হইতে লাগিল। চারুশীলার মনের অবস্থা তখন

কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কল্যকারই ঘটনায় যে পশুপতির অবস্থার হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চারুশীলা এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছে না? ইহা অপেক্ষা মানসিক যন্ত্রণা আর কি অধিক হইতে পারে? আর এক কথা—চারুশীলার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বেশ্বরীর ঔষধের গুণে পশুপতি তাহার ক্রীড়া-পুত্তলি হইবে; কিন্তু শেষে দেখিল যে, সেই ঔষধেরগুণে এত লোকের সম্মুখে পশুপতি তাহাকে সজোরে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তখন ইহা অপেক্ষা তাহার অধিক মনস্তাপই বা আর কি অধিক হইতে পারে? আবার প্রথম হইতেই যে স্বামীর আদরে আদরিণী, যে কখন স্বামীর মুখে একটিও উচ্চ কথা শুনে নাই, তাহার পক্ষে বিনা অপরাধে স্বামীর পদাঘাত সহ্য করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মফলের অধীন, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। আজ চারুশীলা ঘটনাস্রোতে এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে যে, স্বামীর পদাঘাতও তাহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইল। আমরা চারুশীলার প্রকৃতি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, এরূপ ঘটনাচক্রে না পড়িলে চারুশীলা কখনই এ অপমান সহ্য করিত না। অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিলে, সে অপমানের গুরুত্বের অনেকটা লাঘব হইয়া থাকে; কিন্তু চারুশীলার এ অপমানের প্রতিশোধ লইবারও কোন উপায় নাই। আমরা

চারুশীলার মনের অবস্থার আভাস-মাত্র দিলাম। ইহাতেই যদি চারুশীলার জন্য কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি তাহার পাপের পরিণাম স্মরণ করিবেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি বাস্তবিকই উন্মাদ হইয়াছেন। গ্রামের নানা লোকে ইহার নানা কারণ উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"পশুপতির চাকরী গেছে বলে পাগল হ'য়ে গিয়েছে।" কেহ বলিল,—"সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছে বলে, ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে।" অন্য কেহ বলিল,—"অমন স্ত্রী যার ঘরে, সে পাগল হবে না ত কি?" কিন্তু কেহই প্রকৃত কারণ অনুমান করিতে পারিল না। প্রকৃত কারণ জানিত, কেবল চারুশীলা ও বিশ্বেশ্বরী। যখন উভয়ের কেহই সে কারণ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, তখন সে কথা কিরূপে আর প্রকাশ হইবে? এই ঘটনার পর হইতে বিশ্বেশ্বরী আর পশুপতির গৃহে আসে না। চারুশীলা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে আনিতে পারে নাই। চারুশীলা এখন বুঝিয়াছে যে, বিশ্বেশ্বরীই তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। চারুশীলা পশুপতির রোগের কারণ জানে; কিন্তু কি করিলে এ রোগের প্রতিকার হয়, এক বিশ্বেশ্বরী ভিন্ন আর কাহারও সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারে না; সুতরাং বিশ্বেশ্বরীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করা তাহার বিশেষ আবশ্যক হইল।

একদিন রাত্রিকালে চারুশীলা গোপনে বিশ্বেশ্বরীর বাড়ী

গিয়া উপস্থিত। বিশ্বেশ্বরী চারুশীলাকে দেখিয়া প্রথমে একটু ভীত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া, চারু-শীলাকে আদর করিয়া বসিতে বলিল। রাগে চারুশীলার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, সুতরাং তাহার সে আদর ভাল লাগিবে কেন? চারু গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"আমি তোর কি অনিষ্ট করেছি, যে তুই আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি?"

চারুশীলার স্বর শুনিয়া এবং আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া, বিশ্বেশ্বরী পুনরায় ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করা বিশ্বেশ্বরী চিরাভ্যস্ত, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—"তুই যত পারিস্ বল্ মা, যত পারিস্ বল্। আমি শুনে অবধি মরে রয়েছি। তোর অদেষ্ট দেখে আমি অবাক্ হয়েছি। ভাল কর্‌তে গিয়ে এমন সর্ব্বনাশ হলো! আমি এত করে, শেষে কলঙ্কের ভাগী হলুম।"

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে, বিশ্বেশ্বরীর চক্ষে জল আসিল। সে জলে অগ্নিতে জলসিঞ্চণের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ চারু-শীলার ক্রোধাগ্নিও নিবিয়া গেল। চারু এবার একটু স্থিরভাবে বলিল,—"এখন উপায় কি, তা বল।"

এ কথার হঠাৎ কি উত্তর দিবে, বিশ্বেশ্বরী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"আমিওত তাই ভাব্‌ছি মা, রাত্রি দিনই তাই ভাব্‌ছি।"

চারুশীলার একমাত্র আশা-ভরসা এখন বিশ্বেশ্বরী। কোন বিষয়ে একধারে হতাশ হইলে, মানুষ কত দিন জীবিত থাকিতে পারে? সেই কারণ যখন কোন আশা না থাকে, তখন মানুষ

জোর করিয়া নূতন আশার সৃষ্টি করিয়া থাকে। চারুশীলার মনে মনে আশা ছিল, যখন বিশ্বেশ্বরীর ঔষধে তাহার স্বামী পাগল হইয়াছে, তখন বিশ্বেশ্বরীর ঔষধে আবার আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া,চারু-শীলার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। তাহার সেই বিষন্ন মুখ দেখিয়া তখন বিশ্বেশ্বরী বলিতে আরম্ভ করিল,—"তুই অত ভাবিস্ কেন মা? আমি বল্‌ছি, আরাম হবে। সেই অষুধ খাইয়ে হলো, কি ভেবে ভেবেই হলো, তার ত ঠিক নেই! অমন কত লোকের হয়েছে, একটু ঠাণ্ডা কর্‌লেই আরাম হয়ে গেছে। তুই ঠাণ্ডা কর্ মা, ঠাণ্ডা কর্।"

চারুশীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমি ঠাণ্ডা কর্‌বো কি করে? আমি যেন তাঁর চক্ষুশূল হয়েছি। মার খেয়ে খেয়ে আমার গতর গেল। কোন জিনিষ খাওয়াতে গেলে, 'আমায় বিষ খাইয়ে মার্‌ছে' ব'লে, চীৎকার করে উঠে। আমার হাতে কোন জিনিষ খেতে চায় না। আমি দিন রাত্রি যে ভোগটা ভুগ্‌ছি, তা আর তোমায় কি বল্‌বো?"

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে চারুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"তুই কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিস্‌নে। তোর চোখে জল দেখ্‌লে, আমার প্রাণ ফেটে যায়।"

এইবার বিশ্বেশ্বরীও কাঁদিয়া আকুল! সে কান্নায় আর কোন ফল হউক আর না হউক, চারুশীলা একবারে জল হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরীর প্রতি যে ক্রোধ, দ্বেষ ও প্রতিহিংসার বহ্নি তাহার মনে জ্বলিতেছিল, সে সমস্তই এখন একবারে নিবিয়া

গেল। পুনরায় বিশ্বেশ্বরীকে তাহার একজন হিতৈষিণী বলিয়া, চারুশীলার দৃঢ়বিশ্বাস হইল। ধন্য বিশ্বেশ্বরী! ধন্য তোমার কুহক!

তখন চারুশীলা, বিশ্বেশ্বরীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কান্না আর থামিল না। কাঁদিতে পারিলে প্রাণের জ্বালা অনেক নিবারণ হয়; এ কান্নায় চারুশীলার অন্য কোন উপকার হউক বা না হউক, প্রাণের জ্বালা অনেকটা নিবারণ হইল। এখন চারুশীলার সে সুখের দিন আর নাই। স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী আর সংসারের আদরে আদরিণী চারুশীলা—এখন পথের ভিখারিণী। তাহার জীবন এখন যন্ত্রণাময়,এক মুহূর্ত্তের জন্যও চারুশীলা সুখী নহে। তাহার যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিলে, এখন তাহার জন্যও দুঃখ হয়; তাহার পাপের আমরা কোন পরিমাণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রায়-শ্চিত্ত দেখিলে তাহার জন্যও প্রাণ কাঁদে। স্বামী গৃহে আসিয়া যে চারুশীলার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, এখন সেই চারুশীলা অন্ন বস্ত্রের জন্য লালায়িতা। যে শাশুড়ী 'ছোট বৌ' বলিতে অজ্ঞান হইত, এবং যাহার অযথা আদরে চারুশীলার পরকাল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন সেই শাশুড়ী, সেই আদরের পুত্রবধূর আর কোন অনুসন্ধানই লয় না। যে স্বামী তেমন পতিপ্রাণা তারাসুন্দরীকেও ভুলিয়া তাহার ক্রীতদাস হইয়াছিল, এখন সেই স্বামীর অত্যাচারে চারুশীলা প্রাণভয়ে ভীতা! তবে আর প্রায়শ্চিত্তের বাকী কি?

কিন্তু এখনও বাকী আছে। আমরা ভবিষ্যৎ গণনা না জানিলেও লক্ষণ দেখিয়া বলিতে পারি যে এখনও বাকি আছে।

যদি চারুশীলার প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হইবে, তবে বিশ্বেশ্বরীর সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইবে কেন?'

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা এ সময় একবার তারাসুন্দরীর সংবাদ লইব। যে অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি, সে অবস্থার কথা হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় তারাসুন্দরীর জন্য আমাদের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তবে সন্তোষের অস্ত্রাঘাত যে সাংঘাতিক হয় নাই, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম বলিয়াই এতদিন তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম। তাহা না হইলে এমন কঠিন প্রাণ কাহার, যে তারার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

সন্তোষ যখন তারাকে হত্যা করিতে যায়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিরাপরাধা স্নেহময়ী ভগিনীকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার সেই পাষাণহৃদয় যে বিচলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর তাহার সেই কোমল হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিতে গিয়া, সন্তোষের সতেজ বাহু যে তেজহীন হইয়াছিল, একথাও সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অস্ত্রাঘাতের পর তারাসুন্দরীর চীৎকারে যখন সকলে জাগরিত হইয়া তাহার শয়নগৃহে দৌড়িয়া আসিল, তখন কে এ সর্ব্বনাশ করিল—এ কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইলেও, ভ্রাতৃবৎসলা তারা, ভ্রাতার জীবনের আশঙ্কায় ভীত হইয়া, ভ্রাতার নাম মুখে আনে নাই। কিন্তু একজন ভৃত্য সন্তোষকুমারকে সেই

সময় তারার গৃহহইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল; সুতরাং তারাসুন্দরী যে কথা গোপন করিবার চেষ্টায় ছিল, সে কথা আর গোপন রহিল না। তখন সে কথা যাহাতে পুলিষের লোকে না জানিতে পারে, তাহার জন্য, তারাসুন্দরী অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও, সকলকে তাহার উপায় করিতে বলিয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে গিরিবালার হত্যা এবং সন্তোষের আত্ম-হত্যার সংবাদ যখন সহরময় প্রচার হইয়া পড়িল, তখন সে সংবাদ সন্তোষের বাড়ীর কাহারও শুনিতে বাকি রহিল না; কেবল সন্তোষের পিসিমাতা ও তারাসুন্দরীকে সে অশুভ সংবাদ গোপন করা হইল। এদিকে তারাসুন্দরীর রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তারা দুই তিন দিনের মধ্যেই অনেকটা যখন আরোগ্য হইল, তখন পিসিমাতা সে সংবাদ প্রথমে শুনিলেন। তিনি শুনিবার পরমুহূর্ত্তেই তারাসুন্দরীও সে কথা শুনিল। তারার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ভ্রাতার অস্ত্রাঘাতে তারা এতদূর ব্যথিত হয়নাই; যতদূর ব্যথিত তারা তাহার এইরূপ শোচনীয় পরিণামের সংবাদ পাইয়া হইয়াছিল। ভগিনী-হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা! নিজের জীবন-হন্তা ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে তারা অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ধন্য তারা!

* * * *

তারা এখন একপ্রকার সুস্থ হইয়াছে। ভ্রাতৃশোকের ভারও অনেকটা এখন লাঘব হইয়াছে। এমন সময় এ কি সংবাদ! তারার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী নাকি উন্মাদ হইয়াছে? তারার যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাতে সকলই সম্ভব হইতে পারে। এ সংবাদ পাইয়া, তারা কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তারা তখনও

দুর্ব্বলতার দরুণ শয্যায় শুইয়া থাকিত। এ সংবাদ পাইবামাত্র কোথা হইতে তারার যেন বল আসিল। তারা দৌড়িয়া শাশুড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পশুপতি-জননীও যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। হাজার হউক, মার প্রাণ, পুত্রের এরূপ অমঙ্গল সংবাদে কি আর স্থির থাকিতে পারে? শাশুড়ীর কান্না দেখিয়া, তারাসুন্দরীও চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা, আর রাগ অভিমানে কাজ নেই; চল আমরা কোন্নগরে যাই।"

পশুপতি-জননীও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"তুমি এখনও কাহিল, এ অবস্থায় তোমায় নিয়ে যাই কি করে? তুমি থাক, আমি যাই। পারি যদি, তবে এইস্থানে এনেই চিকিৎসা করবো।"

তারাসুন্দরী।—না মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি আর কাহিল নই, এখানে যদি তাঁকে না আসতে দেয়, তবে আমি এখানে কি করে থাকবো মা?

পশুপতি-জননী।—এখানে না আনলে চিকিৎসা হবে কেন?

তারাসুন্দরী।—তিনি যেখানে থাকলে সুখী হবেন, তিনি সেইখানেই থাকবেন। চিকিৎসার ভাবনা কি মা? আমি কলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ নিয়ে যাব। আমার তো টাকার অভাব নেই মা।

পশুপতি-জননী।—বাবার আমার টাকার ভাবনা ভেবে ভেবেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তারাসুন্দরী।—তাঁর আবার টাকার ভাবনা কি মা? এ সমস্তই তো তাঁর।

এই সময় সেই বিধুমুখী ঝি গর্জ্জিয়া উঠিল,—"টাকার জন্য ভেবে বাবুর মাথা খারাপ হয়-নি, এ সেই সর্ব্বনাশী বিষি-পিসি আর ছোট বউয়ের কাজ। হয় ত অষুধ কর্‌তে গিয়ে কি খাইয়ে দিয়ে পাগল করে ফেলেছে।"

বিধু-ঝির কথা শুনিয়া, তারাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিল! এবং বিস্মিতনেত্রে বিধু ঝি এবং শাশুড়ীর মুখের প্রতি বারংবার চাহিতে লাগিল। পশুপতি-জননী বলিলেন,—"তা হবে, তাদের অসাধ্য কাজ নেই। এখন আমার বাছা কি করে আরাম হবে।"

সরলা তারাসুন্দরীর মনে কিন্তু এরূপ বিশ্বাস কোনক্রমে স্থান পাইল না। তারা বলিল,—"এখন সে সকল কথা থাক্; আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। আমি গাড়ী আন্‌তে পাঠাই, আর টাকাকড়ি গুছিয়ে নিই; মা, তুমি যে-কিছু জিনিষপত্র আবশ্যক বোধ কর, সব ঠিক্ করে নেও।"

এই সময় বিধু-ঝি বলিল,—"একটা দরোয়ান আর দুটো চাকর আমাদের সঙ্গে নিতে হবে।"

তারাসুন্দরী বলিল,—"দরোয়ান চাকর নিয়ে গেলে, লোকে বড়মানুষী জানাতে এসেছে, মনে কর্‌বে। সে সব দরকার নেই, কেবল তুমি সঙ্গে গেলেই হবে।"

বিধু-ঝি এবার যেন রাগিয়া বলিল,—"হাঁ গা আমি কি বড়-মানুষী দেখাবার জন্যেই দরোয়ান-চাকর নিয়ে যেতেছি! দরোয়ান-চাকর না নিয়ে গেলে, বাবুর চিকিৎসা করাবে কি করে? বাবুকে নাওয়াতে খাওয়াতে যে তোমার লোকের দরকার হবে।"

একজন নীচ-বংশীয়া পরিচারিকার এরূপ বুদ্ধি দেখিয়া তারাসুন্দরী আশ্চর্য্য হইল। বাস্তবিক সেই কলহপ্রিয় বিধুমুখীর এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তন কিন্তু তারাসুন্দরীর গুণে!

এক ঘণ্টার মধ্যে সকলই প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় তারাসুন্দরী, পিসিমাতাকে সাংসারিক ও বৈষয়িক সমস্ত ভার দিয়া আসিল। পিসিমাতা তখনও সন্তোষের শোক ভুলিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি কোন ভারই লইলেন না। তারা অগত্যা একজন সরকারের উপর সমস্ত ভার দিয়া, কোন্নগর যাত্রা করিল। তখন সংসার কিম্বা বিষয় কি তারাকে ধরিয়া রাখিতে পারে?

দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই তারাসুন্দরী নৌকাযোগে কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরীর সঙ্গে লোকজন ও অনেক জিনিষপত্র ছিল; সুতরাং তাহার আগমন-সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকমহলে একটা হুলস্থুল পড়িল। তারাসুন্দরীর পিতৃসম্পত্তি লাভের সংবাদ যাহারা জানিত, তাহারা দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। অর্থের কি মহিমা!

এদিকে চারুশীলা, হঠাৎ তারাসুন্দরীকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল! এ বিস্ময়ের কারণ অন্য কিছুই নহে—এ ঘটনা চারুশীলার, আশাতীত। কিন্তু এবার শাশুড়ী ও সতিনীকে দেখিয়া চারুশীলা দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হইয়াছিল। চারু যে যন্ত্রণা প্রত্যহ সহ্য করিতেছে, এখন তাহার সে যন্ত্রণার লাঘব হইবে নিশ্চয় জানিয়া, সে আহ্লাদিত না হইবে

কেন? চারু, শাশুড়ী ও সতিনীকে অভ্যর্থনা করিতে করিতেই কাঁদিয়া ফেলিল। শাশুড়ী আর তারাসুন্দরীর চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ, তখন তিন জনে একত্রে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রতিবাসীদিগের মধ্যেও অনেকে সেই কান্নায় যোগ দিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরীর ক্রন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় উঠিয়াছিল!

সকলে দেখিতে আসিল, আর পশুপতি কোথায়? পশুপতিও দেখিতে আসিল। আসিয়া, জননীকে প্রণাম করিল। জননী, তাহার বিবর্ণ মুখ আর শীর্ণ দেহ দেখিয়া, কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া, পশুপতি হাসিতে আরম্ভ করিল! জননী যত কাঁদিল, পশুপতি তত হাসিল! সে হাসি দেখিয়া, আর কেহ কি কাঁদে নাই? আর একজন কাঁদিয়াছিল, কিন্তু সে কান্নার প্রতি কেহ তখন লক্ষ্য করে নাই। হাসির উত্তর কান্না, আর কান্নার উত্তর হাসি—সংসারের এ রহস্য আমাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে?

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথমেই পশুপতির চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। এখন আর পশুপতির লোকের অভাব নাই। গ্রামের ছোট-বড় সকলেই এখন পশুপতির বড়-স্ত্রীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছিল, সুতরাং পশুপতির আর লোকের অভাব হইবে কেন? চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যায়লঙ্কার, বসুজ ও মিত্রজ প্রভৃতিতে পশুপতির বাড়ী এখন সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে; সকলেই এখন যেন পশুপতির মঙ্গলের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছে। সুক-

লের পরামর্শে পশুপতির জন্য কবিরাজী-চিকিৎসাই স্থির হইল। তখন কলিকাতার প্রধান প্রধান সমস্ত কবিরাজকে একত্রিত করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইল। তাঁহারা যেরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, তাহার কোন ত্রুটিই হইল না। কেনই বা ত্রুটি হইবে? তারাসুন্দরী, পশুপতির আরোগ্য-লাভের জন্য তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত।

তারাসুন্দরী তাহার পর চারুশীলার সন্তোষের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পশুপতির দুঃখের অবস্থায় চারুশীলার প্রায় সমস্ত অলঙ্কারাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তারাসুন্দরী জানিত—সে অত্যন্ত অলঙ্কারাদি-প্রিয়; সেই কারণ তারাসুন্দরী তাহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার চারুশীলার অঙ্গে পরাইয়া দিল। বাস্তবিক তারাসুন্দরীর এরূপ ব্যবহারে চারুশীলার সতিনী-বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে হ্রাসও হইয়াছিল; কিন্তু এই সময় বিশ্বেশ্বরী তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল,—"তুই ছেলে-মানুষ, বুঝিস্-নি মা—বুঝিস্-নি। তোকে গায়ের গয়না খুলে কেন দিচ্ছে,জানিস?"

চারুশীলা অমনি আগ্রহের সহিত বলিল,—"কেন পিসিমা?"

বিশ্বেশ্বরী।—তুই ছেলে-মানুষ, গয়না পেলেই প'রে বসে থাক্‌বি বলে।

চারুশীলা।—গয়না পরায় দোষ কি পিসিমা?

বিশ্বেশ্বরী।—এখন পশুপতির এই রকম ব্যারাম, এ সময় গয়না পর্‌লে লোকে তোকে নিন্দে কর্‌বে যে! এতো তোমার আর গায়ে গয়না পরা নয়, এ কেবল নিন্দে গায়ে মাখা।

চারুশীলা।—এতক্ষণে আমি বুঝেছি। আমি সাদাসিদে মানুষ; আমি অত ঘোর-প্যাঁচ কি বুঝি পিসিমা?

বিশ্বেশ্বরী।—তাই ত বল্‌ছি মা, তুই ছেলে-মানুষ, দু'খানা গয়না পরেই আহ্লাদে আটখানা হয়েছ। ভেতরে ভেতরে কি কারখানা যে হচ্ছে, তাত বুঝ্‌তে পার না?

চারুশীলা।—এর্ ভেতর এত তত্ত্ব, আমি কি করে বুঝ্‌বো!

বিশ্বেশ্বরী।—আর কিছু বুঝ্‌তে পার, আর না পার, এইটী ঠিক মনে রেখে দিও যে, সতীন কখনও আপ্‌নার হয় না। সতীন ভাল করলেও, সেটা মন্দ ধরে নিতে হবে।

চারুশীলার তখন বিশ্বেশ্বরীর কথাটা মনে পুনরায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া গেল। এরূপ সুপরামর্শদাতা থাকিতে, তারাসুন্দরীর সতিনীর সহিত সদ্ভাবের চেষ্টার কি কোন ফল হইতে পারে? আমরা এইস্থলে আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পশুপতি-জননী বিশ্বেশ্বরীকে এখন ভালরূপ চিনিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি বিশ্বেশ্বরীকে বাড়ীতে দেখিলেই মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেন। বিশ্বেশ্বরীও সেই বিরক্তিভাব মনে মনে বুঝিতে পারিত, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিত না। পশুপতি-জননী মুখের উপর তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না; সেই কারণ বিধু-ঝি দ্বারা বিশ্বেশ্বরীকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিবার মনস্থ করিলেন। বিধু-ঝিও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল; এমন কি, কেবল মুখের কথায় নয়, বিধু-ঝির মতলবে ইহা ব্যতীত আরও কিছু ছিল। কিন্তু তারাসুন্দরী, সে কথা শুনিয়া, শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"মা, একে আমাদের অদৃষ্ট ভাল নয়, এ সময় কারো মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।"

এখন তারাসুন্দরী, নিজগুণে শাশুড়ীকে বাধ্য করিয়াছিল;

সুতরাং পশুপতি-জননী পুত্রবধূর অনুরোধে বিশ্বেশ্বরীকে আর বাড়ী আসিতে নিষেধ করিলেন না। এ ঘটনায় বিধু-ঝি কিন্তু বড়ই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সংসারে বিশ্বেশ্বরীর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও আসা-যাওয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল।

এখন পশুপতি-সম্বন্ধে একদিনের ঘটনার বিষয় বলি, শুনুন। পশুপতি যে সকল সময়ই উন্মাদ অবস্থায় থাকে, তাহা নহে। সময়ে সময়ে এরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতে দেখা যায় যে, তাহাকে পাগল বলিয়া মনে হয় না। পশুপতির পাগলামীর মধ্যে ঐ হাসি, আর পানাহার প্রভৃতি বিষাদি মিশ্রিত বলিয়া সন্দেহভাব। কখন কখন কাহার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিতেও ভাল বাসে না, কেবল নির্জ্জনে বিমর্ষভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতে থাকে। এ সময় কেহ কথা কহিতে যাইলে, বিরক্ত হইয়া রাগিয়া উঠিত। কবিরাজেরা বলিয়াছেন, এ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। তবে কত দিনে হইবে, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন না।

সময়ে সময়ে পাগলের নানাপ্রকার খেয়ালও ছিল। প্রত্যহ দুইজন চাকরে, প্রাতে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া, কবিরাজদিগের প্রদত্ত তৈল মাখাইত। একদিন পশুপতির খেয়াল চাপিল যে, চাকরের দ্বারা তৈল মাখা হইবে না। এ ঘটনা অন্তঃপুরের মধ্যেই হইতেছিল; সুতরাং পশুপতি-জননী, চারুশীলাকেই পুত্রের প্রিয় জানিয়া, তাহাকেই তৈল মাখাইতে বলিলেন। চারুশীলা অগত্যা তখন ভয়ে ভয়ে তৈল মাখাইতে গেল। পশুপতি প্রথমে কোন কথাই কহিল না; চারুশীলাও সাহস করিয়া তৈল মাখাইতে আরম্ভ করিল। পশুপতি কিছুক্ষণ

তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"তুই আমায় বিষ মাখাচ্ছিস্! বিষ খাইয়ে বুঝি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়-নি, তাই বিষ মাখাতে এসেছিস্?"

চারুশীলারও বড় রাগ হইল। তত লোকের সম্মুখে—বিশেষতঃ সতিনীর সম্মুখে—স্বামীর আদরে আদরিণী চারুশীলার প্রতি স্বামীর মুখেই এই কথা! চারুশীলা রাগিয়া স্বামীকে একটা দুর্ব্বাক্য বলিল। তখন পশুপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া চারুশীলার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া এমন প্রহার আরম্ভ করিল যে, ৪।৫ জন লোকের সাহার্য্যে চারুশীলাকে সেস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। চারুশীলা স্থানান্তরিত হইলে, তখন পশুপতি-জননী তৈল মাখাইতে গেলেন। কিন্তু পশুপতি তাঁহাকে তৈল মাখাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি তেল মাখাবে কেন? আমায় কি তেল মাখাবার আর কেউ নেই?"

পশুপতির ক্রোধের তখনও উপশম হয় নাই; সুতরাং এক তারাসুন্দরী ব্যতীত তাহাকে তৈল মাখাইতে যাইতে আর কাহার সাহস হইবে? পাছে স্বামী বিরক্ত হন, এই ভয়ে, তারাএ সময় স্বামীর সম্মুখে প্রায়ই যাইত না। কিন্তু এখন আর থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তৈল মাখাইতে বসিল। তারাসুন্দরীকে দেখিয়া, পশুপতি আর কোন কথা বলিল না, ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া স্থিরভাবে বসিয়া তৈল মাখিল। অনেকে এই ঘটনা দেখিতেছিল, তাহাদের মধ্য বিশ্বেশ্বরীও ছিল। বিশ্বেশ্বরী, পশুপতিকে ধীরভাবে তৈল মাখিতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি চারুশীলার নিকট গেল। চারুশীলা তখন শয্যায় শুইয়া আপনার চক্ষের জলে বিছানার

বালিশ ভিজাইতে ছিল। বিশ্বেশ্বরী তাহাকে ঠেলিয়া বলিল,—"ছোটবউ মা, শীগ্‌গির ওঠ—শীগ্‌গির ওঠ্, একটা মজা দেখ্‌বি আয়?"

চারুশীলা তখনও প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির। সুতরাং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি আপ্‌নার জ্বালায় মরি, এখন কি আমার মজা দেখ্‌বার [illegible]?"

বিশ্বেশ্বরী উত্তর করিল,—"এ মজা দেখে যদি মরেও যাও, তা হলেও মনে কোন আপ্‌শোষ থাক্‌বে না।"

একথা শুনিয়া, চারুশীলা কি আর চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারে? কোথা হইতে তখন তাহার বল আসিল। চারুশীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"কি দেখাবে?"

বিশ্বেশ্বরী তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আর কোথাও যেতে হবে না, এই ঘরের ঐ জানালা থেকেই দেখ।"

চারুশীলা তাড়াতাড়ি সেই জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে চারুশীলা আর দাঁড়াইতে পারিল না। চারুশীলা কি স্বপ্ন দেখিতেছে—না ইহাই সত্যঘটনা! চারুশীলা প্রথমে স্বপ্নই মনে করিল। কিন্তু এইমাত্র যেস্থান হইতে চারুশীলা প্রহার খাইয়া আসিয়াছে, সেই স্থান স্বচক্ষে দেখিতেছে; যে সকল লোক তথায় ছিল, তাহারা এখনও বসিয়া রহিয়াছে, তাহাও চারুশীলা দেখিতে পাইতেছে; তবে আর স্বপ্ন ভাবিবে কি প্রকারে? ভগবান্! এরূপ দৃশ্য দেখান অপেক্ষা চারুশীলাকে অন্ধ করিলে না কেন? ঐ কি পশুপতি?

আর ঐ কি তারাসুন্দরী? চারুশীলার আর অবিশ্বাস নাই। এক দৃশ্য দেখাইয়াই বিশ্বেশ্বরীর কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেল!

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি শুনুন। পশুপতি আহারে বসিয়াছে; জননী নিকটে বসিয়া তাহাকে আহার করাইতেছেন। এমন সময় পশুপতির এক গেলাস জলের আবশ্যক হইল। জননী চীৎকার করিয়া জল চাহিলেন। নিকটে চারুশীলা ছিল, দৌড়িয়া এক গেলাস জল লইয়া উপস্থিত হইল। চারুশীলা গেলাসটি পশুপতির সম্মুখে রাখিলেই, পশুপতি "বিষ বিষ!" করিতে করিতে, সেই গেলাস ছুড়িয়া চারুশীলার মাথায় মারিল। চারুশীলা সেই আঘাতে সেই স্থানেই ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। এই সময় তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল আনিয়া দিল; পশুপতি সেই জল পান করিয়া সুস্থির হইল। চারুশীলা সেইখানে পড়িয়া থাকিয়া, এ ঘটনাও স্বচক্ষে দেখিল। এখন আপনারা বলুন দেখি, চারুশীলা কোন্ আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে? তাহার কোন্ আঘাত গুরুতর? মস্তকের আঘাত, না হৃদয়ের আঘাত?

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, চারুশীলা বিশ্বেশ্বরীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমার আর সহ্য হয় না, তুমি এর কোন উপায় কর; তা নইলে আমি বিষ খেয়ে মর্‌বো।"

চারুশীলার এ কথা শুনিয়া কি বিশ্বেশ্বরী আর চক্ষের

জল রাখিতে পারে? সে মনে মনে হাসিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আহা! তোর বড় কষ্টই হ'য়েছে, এ কি কেউ সহ্য কর্‌তে পারে গা? লোকে কথায় বলে, 'ভাতের ভাগ দেওয়া যায়, কিন্তু সোয়ামীর ভাগ দেওয়া যায় না।' তোর কথা শুনে, আমার প্রাণ ফেটে যায়।"

এই কথা বলিয়াই, বিশ্বেশ্বরী কাঁদিয়া আকুল! চারুশীলা পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমায় বিষ এনে দাও, আমি বিষ খেয়ে মর্‌বো।"

বিশ্বেশ্বরী, চারুশীলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"আর আমায় কাঁদাস্‌নে মা—কাঁদাস্‌নে। বালাই, তুই বিষ খেয়ে মর্‌বি কেন? তোর অমন সোণারচাঁদ ছেলে, এ ছেলে সতীনের হাতে সঁপে দিয়ে কি তুই কি মর্‌তে পার্‌বি?"

চারুশীলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার যে আর সহ্য হয় না।"

বিশ্বেশ্বরী, একটী সুদীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চারিদিক চাহিয়া দন্তেদন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"বিষ খেয়ে নিজে মরার চেয়ে, বিষ খাইয়ে নিষ্কণ্টক হওয়া ভাল!"

কি ভয়ঙ্কর কথা! কি ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গিমা! চারুশীলা, বিশ্বেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া, শিহরিয়া উঠিল! বিশ্বেশ্বরী তৎক্ষণাৎ পুনরায় মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া আরম্ভ করিল,—"শত্রু মার্‌লে কোন পাপ নেই মা। পুরাণে শোননি, দেবতারাও শত্রুদের স্বহস্তে মার্‌তেন। আর তুই ছেলে মানুষ, কদিন সুখে সংসার করেছিস্‌, বল্‌? কবিরাজেরা বলেছেন, পশুপতি আর দশ পনের দিনের মধ্যেই আরাম হবে

উঠ্‌বে; এই বেলা শক্রনিপাত হলে, তুই আবার সুখে ঘরকন্না করতে পার্‌বি।"

চারুশীলার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল! কিন্তু তথাপি কি কুক্ষণে হঠাৎ চারুশীলার মুখ হইতে বাহির হইল—"আমি বিষ পাবো কোথা?"

এত দুঃখের সময়ও, বিশ্বেশ্বরীর মনের হাসি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশ্বেশ্বরী সে হাসিকে চাপিয়া রাখিয়া বলিল, —"সে জন্য তোর ভাব্‌তে হবে না। আমার ঘরে বিষ আছে, আমি এখনি আন্‌ছি।"

এই কথা বলিয়াই বিশ্বেশ্বরী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। চারুশীলার সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত করিল না! চারুশীলা সেইখানে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই, বিশ্বেশ্বরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। বিশ্বেশ্বরী আসিয়াই চারিদিক চাহিয়া একটী কৌটা চারুশীলার হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল, —"এই নে। এই কৌটার মধ্যে বিষ আছে, দুধের সঙ্গে খাইয়ে দিলেই কাজ ফরসা হবে। আজ রাত্রে খাইয়ে দিতে পার্‌লেই ভাল হয়। তুই তো সকলকে দুধ ভাগ করে দিস্, আজই কেন সেই দুধের সঙ্গে খাইয়ে দেনা।"

বিশ্বেশ্বরী যখন তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া এই সকল কথা বলিতেছিল, তখন চারুশীলার বুকের ভিতর কে যেন ঢেকীতে ধান ভানিতেছিল; সুতরাং ভয়ে চারুশীলার মুখে কথা আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ পর চারুশীলা বলিল,—"আমার বড় ভয় করে!"

বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বড় বিরক্ত হইল। কিন্তু সে ভাব

প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন মা আমার। লক্ষ্মী মা আমার—এই কাজটি ক'রে চিরদিন সুখে ঘরকন্নাকর। আর এ কতক্ষণের কাজ মা ?"

আহা! বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলি কি মিষ্ট! তত্রাচ সেই মিষ্ট কথাতেই চারুশীলার গলা হইতে বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে কথা বাহির হয় না, অনেক কষ্টে বলিল,—"আমি তা পার্‌বো না, পিসিমা।"

পিসিমা বড় আশায় নৈরাশ হয়, তখন কাজেই পিসিমা বলিল,—"তবে তুই আমার সুমুখে দুধ ভাগ কর্, আর বড় বউয়ের বাটীটা আমায় দেখিয়ে দে।"

বিশ্বেশ্বরী নিশ্চয় কোন যাদুমন্ত্র জানে; তাহা না হইলে, চারুশীলা তাহার কথায় দুধ ভাগ করিতে যাইবে কেন? প্রতিদিন চারুশীলা যেরূপ প্রথমে একটা বড় বাটীতে তাহার পুত্রের আবশ্যকীয় দুধ ঢালিয়া রাখিত, তাহার পর অন্যান্য সকলের নির্দ্দিষ্ট বাটীতে দুধ ভাগ করিয়া দিত, আজও সেইরূপ করিল, এবং বিশ্বেশ্বরীকে তারাসুন্দরীর দুধের বাটী দেখাইয়া দিল। বিশ্বেশ্বরী, একবার চারিদিক চাহিয়া, সেই কৌটাস্থিত বিষ, তারাসুন্দরীর দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। এমন সময় বিধু-ঝি আসিয়া বলিল,—"ছোট বউমা', বড় বউমার দুধ দাও, আর তুমি একবার রান্নাঘরে এসো।"

ছোট বউমার মুখে আর কথা নাই! বিধুঝির কথায় তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর মুখ তখনও বন্ধ হয় নাই; সে তাড়াতাড়ি সেই বিষমিশ্রিত দুধ বিধুকে দেখাইয়া দিল। বিধু দুধ লইয়া তারাসুন্দরীর পাতের

কাছে রাখিল। বিধুর মনে তখন অন্য কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, কারণ, দুধ কম হইল কি বেশী হইল, কেবল ইহারই প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। তখনও তারাসুন্দরীর আহার শেষ হইতে বিলম্ব ছিল, সুতরাং সেই দুধের বাটী পাতের কাছেই রহিল। এমন সময়, রোরুদ্যমান্ পৌত্রকে কোলে লইয়া পশুপতি-জননী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশু ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে শুনিয়া, তারাসুন্দরী বলিল,—"মা, তুমি আমার ঐ দুধ থেকেই খোকাকে খাওয়াও; আমি অত দুধ খাব না।"

পশুপতি-জননীও সেই অস্থির শিশুকে শীঘ্র সুস্থির করিবার জন্য তাহাকে দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া ছয় ঝিনুক দুধ খাওয়ান হইল। কিন্তু একি! বালকের ক্রন্দন থামিতেছে না কেন? গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি শিশুর ক্ষুধা পায় নাই? কিন্তু আবার একি সর্ব্বনাশ! ক্রন্দন থামিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দুই চক্ষু কপালে উঠিল কেন? এখন গৃহিণী পৌত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। গৃহিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—"ও বড় বউমা! দুধ খেতে খেতে ছেলে এমন ক'রে কেন?"

তারাসুন্দরীর আর আহার হইল না, তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া পড়িয়াই তারা চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গে চারুশীলাও দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু চারু আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে সেইস্থানে আছাড় খাইয়া পড়িল। সেই দুধের কথা যখন তাহার কানে গেল, তখন চারু পুনরায় ধড়ফড়িয়া উঠিয়া সেই

অবশিষ্ট দুধ সমস্ত পান করিয়া ফেলিল। সেই শিশুকে লইয়াই তখন সকলে ব্যস্ত, চারুশীলার প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য ছিল না। কেবল বিশ্বেশ্বরীর তাহার দিকে লক্ষ্য ছিল; সে চারু-শীলাকে সেই বিষমিশ্রিত অবশিষ্ট দুধ পান করিতে দেখিয়া, সকলের অজ্ঞাতসারে তথা হইতে দ্রুত পলায়ন করিল। আর চারুশীলা সেই মেজের উপর পড়িয়া রহিল।

একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিল, কেহ কবিরাজ আনিতে দৌড়িল, কেহ বা গ্রামের লোক ডাকিয়া একত্রিত করিল। পশুপতি-জননী, কেবল কাঁদিয়া গালে চড়াইতে লাগিলেন, আর 'বিধুঝির মনে এই ছিল' বলিয়া তাহাকে গালি দিতেছিলেন। বিধুর মুখে কথা নাই; সে দুই এক চপেটাঘাত পর্য্যন্ত খাইয়াছে, তথাপি কোন কথা কয় নাই। তারাসুন্দরী এই সময়, বড় বুদ্ধির কাজ করিয়া, খোকাকে লবণমিশ্রিত কতকটা জল খাওয়াইয়া দিয়াছিল। সেই কারণ ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই বমন আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন,—"কোন ভয় নাই।"

এই সময় ডাক্তার প্রথমেই সেই অবশিষ্ট দুগ্ধ দেখিতে চাহিলেন। তখন সেই বাটীর প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল। কিন্তু বাটী ত তখন শূন্য—কে যেন তাহা চাটিয়া খাইয়াছে! এইবার চারুশীলা, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তার চারুশীলার অবস্থা দেখিয়াই বলিলেন,—"একি! ইনিও যে বিষ খেয়েছেন!"

তখন সেই অবশিষ্ট দুধ কোথায় গেল, সকলেই বুঝিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, পুত্রের অমঙ্গলের পূর্ব্বেই, স্নেহময়ী জননী বিষ খাইয়া নিজের জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

পুত্র-স্নেহের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া, সকলেরই চক্ষু অশ্রুজলভারাক্রান্ত! প্রথমে শিশুকেই ঔষধ সেবন করান হইল, এবং সে ঔষধে শিশুটির বিশেষ উপকার হইতে দেখা গেল। এমন সময় শিশুর জননীর ঔষধও আসিয়া পৌছিল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু চারুশীলা বলিল,—"আমি অষুধ খাব না। তোম্‌রা যাহাতে আমার খোকাকে বাঁচাতে পার, তার চেষ্টা কর। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি উপযুক্ত ফল হয়েছে।"

চারুশীলার কথা শুনিয়া, সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল; কাহারও মুখে আর কথা নাই। পশুপতি-জননী এইবার বলিলেন,—"তবে কি তুই বড় বউকে বিষ খাইয়ে মার্‌তে গিয়েছিলি!"

সে কথা শুনিয়া, সকলেই যেন শিহরিয়া উঠিল। চারুশীলা পুনরায় আরম্ভ করিল,—"আমি নই। আমি ত বিষ খেয়ে মর্‌তে চেয়েছিলেম্‌; বিষী পিসি তাই, আমার ভালোর তরে আমার সতীনকে বিষ খাওয়াইয়ে মার্‌বার জন্যে, তার দুধের বাটীতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো। সেই এ সর্ব্বনাশ করেছে, আর সেই আমার স্বামীকে অষুধ খাইয়ে পাগল করেছে।"

সকলে আগ্রহের সহিত চারুশীলার কথা শুনিল। সে কথা শুনিয়া, সকলেই বিস্মিত হইল। তখন বিশ্বেশ্বরীর খোঁজ পড়িয়া গেল। কিন্তু কেহ আর তাহার দেখা পাইল না। বিধু-ঝি সেই অন্ধকার রাত্রে তাহার বাটী পর্য্যন্ত দৌড়িল। আর কাহারও মুখে কথা নাই। তখন ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার ছেলের কোন ভয় নাই, সে আরাম হয়ে গিয়েছে।

এখন তুমি ঔষধ খাও, নইলে তোমায় বাঁচাতে পার্‌বো না।”

এই কথা বলিয়াই, ডাক্তার জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোগী ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন ডাক্তার বাবু এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“সুরেন বাবু, আমি রোগীর অবস্থা ভাল বুঝ্‌ছি না। আপ্‌নি গ্রামের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এই সময় dying declaration লিখিয়া লউন, এর পর সে সময় আর পাবেন না।”

যেরূপ ভয়ানক ঘটনা, তাহাতে সুরেন বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, অনেক কষ্টে রোগীর এজাহার লিখিয়া লইলেন। তাহার পর চারুশীলা, তারাসুন্দরীকে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল; আর তাহার ‘খোকাকে’ তারাসুন্দরীর কোলে তুলিয়া দিয়া, চারুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মের মত বিদায় লইল। একবার পশুপতিকেও দেখিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পশুপতি যে সময় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সে সময় চারু মৃত কি জীবিত, কেহ স্থির করিতে পারিল না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছে! পুলিশের বড় হুজুর আর ছোট হুজুরে গ্রাম পরিপূর্ণ। রাত্রিতেই পুলিষে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিষের প্রথম কার্য্য হইল, বিশ্বেশ্বরীকে গ্রেপ্তার করা। পুলিষ এ কার্য্য এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না, যদি সেই রাত্রে বিশ্বেশ্বরীর গৃহে বিধুমুখীর পদার্পণ না হইত।

বিধু সেই রাত্রে বিশ্বেশ্বরীর গৃহে গিয়া দেখিল যে, তখনও তাহার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। এত রাত্রে বিশ্বেশ্বরী আলো জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে কি করিতেছে, জানিবার জন্য বিধু ধীরে ধীরে জানালার নিকট গিয়া দেখিল, যে বিশ্বেশ্বরীর যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল, সেই সমস্ত একত্রে বাঁধিয়া এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি করিতেছে। বিশ্বেশ্বরী যে পলায়নের উদ্যোগে ব্যস্ত, তাহা আর বিধুর জানিতে বাকি রহিল না। তখন বিধু এক বড় বুদ্ধির কাজ করিল; তৎক্ষণাৎ দরজার শিকল তুলিয়া দিল। একটি চাবিতালাও তাহাতে লাগান ছিল; বিধু আস্তে আস্তে চাবি বন্ধ করিল। তখন বিধুর বুদ্ধি কৌশলে বাঘিনী পিঞ্জরাবদ্ধ হইল!

জানালায় মুখ বাড়াইয়া বিধু আরম্ভ করিল,—"এত রাত্রে ঘরেব মধ্যে আলো জ্বেলে, কি হচ্ছে?"

বিধুর স্বর শুনিয়া, বিশ্বেশ্বরী চম্‌কিয়া উঠিল। প্রথমেই থতমত খাইয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"দাঁতেয় গোড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি মা, চোখের পাতা বুঁজ্‌তে পারিনে, তাই বসে বসে অষুধ লাগাচ্ছি।"

বিশ্বেশ্বরীর কথায় বিধু হাসিয়া ফেলিল। সে যন্ত্রণা-সূচক স্বর শুনিলে, কেহ না হাসিয়া থাকিতে পারে না। বিধু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর ঐ পুঁটুলিটি বাঁধা হচ্ছিল কেন?"

বিশ্বেশ্বরী অম্লানবদনে বলিল,—"ঐ পুঁটুলিতেই অষুধ রেখেছিলুম, মা।"

বিধু পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তবে বসে বসে অষুধ লাগাও, আমি ঘরে যাই।"

বিধুর হাসি, বিশ্বেশ্বরীর কানে ভাল লাগিল না। বিশ্বেশ্বরী, বিষণ্ণ মুখ আর একবার প্রফুল্ল করিয়া লইয়া, বলিল,—"এত রাত্রে কি মনে করে এসেছিস্, মা ?"

বিধু এবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"যা মনে করে এসেছিলুম, সে কাজ আমার হয়ে গেছে; এখন ঘরে যাই।"

বিশ্বেশ্বরী আর কতক্ষণ মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিবে? বিশ্বেশ্বরী শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মনে করে এসেছিলি, মা ?"

বিধুর মুখে আর হাসি নাই। বিধু তখন হুঙ্কার করিয়া বলিল,—"তোমার শ্রাদ্ধ করবো বলে।"

বিশ্বেশ্বরী একেবারে দমিয়া গেল। তাহার মুখ আরও বিষণ্ণ হইল। কিন্তু তখনও বিশ্বেশ্বরী বলিল,—"কেন, আমি কি করেছি ?"

বিধু এবার বজ্রনাদে বলিল,—"তুই বিষ খাইয়ে খুন করেছিস্, সহজ মানুষকে অষুধ খাইয়ে পাগল করেছিস্—তুই না করেছিস্ কি ?"

বিশ্বেশ্বরী তখনও হাল ছাড়ে নাই। এইবার সকরুণস্বরে বলিল,—"ধর্ম্ম জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নই।"

বিধু গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তুই আর ধর্ম্মের নাম মুখে আনিস্‌নে, তোর মতন অধার্ম্মিক ভূভারতে নেই। তুই যার খাস্, তারই সর্ব্বনাশ করিস্। তোর কুমন্ত্রণাতেই ত আমার বাবুর সংসার মাটি হয়ে গেল !"

অনেকক্ষণ বিশ্বেশ্বরী কি ভাবিল। সে যে গৃহের মধ্যে চাবি

বন্ধ, তথনও সে কথা বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ কি মনে করিয়া, বিশ্বেশ্বরী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"তুই ভালখাগী, এত রাত্রে ঘর ব'য়ে ঝগড়া করতে এসেছিস্, কেনলা? বেরো—আমার বাড়ী থেকে, নইলে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেবো।"

বিশ্বেশ্বরী এখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে। কিন্তু বিধু তাহাতে ভীত হইবে কেন? সে তখন অতি সুশ্রাব্য ভাষায় ভূতছাড়ান মন্ত্র আরম্ভ করিল। বিশ্বেশ্বরী রাগিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে গিয়া দেখিল যে, বাহির হইতে ঘরের দরজা বন্ধ। তখন বিশ্বেশ্বরীর চৈতন্য হইল! তাহার প্রাণ ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। অগত্যা পুনরায় বিধুকে মিনতি করিয়া বলিল,—"লক্ষ্মী মা, আমার মুখে আগুন, মনে হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, তা কিছু মনে করিস্না মা। একবার দরজাটা খুলে আমার ঘরের ভিতর আয়। এত রাত্রে আর কোথায় যাবি? এইখানেই শুয়ে থাক্।"

বিধু যখন রাগিয়াছে, তখন শীঘ্র আর স্থির হইতে পারিল না। বিধু সেইরূপ কর্কশস্বরেই বলিল,—"আমি দরজা খুল্বো কেন, পুলিসের লোক এসে দরজা খুল্বে এখন। আজ যে আমার হাতে দড়ি দেবার যো করেছিলে! আমার হাত দিয়ে বিষ পাঠিয়ে দিয়ে, তুই বড়বউকে মার্বার মতলব করেছিলি নয়! এখন ছোটবউ যে তোর সব গুণের কথা পের্কাশ করে দিয়েছে! এখন যাও—ফাঁসিকাটে ঝোল্ গিয়ে! বেটীকে ডাল্কোত্তা দিয়ে খাওয়ালে, তবে রাগ যায়। আমি দরজা খুলে ঘরের ভেতর যাই, আর উনি সেই তক্কো পালিয়ে যান আর কি! হারামজাদীর এখনও বদ্মায়েসী মতলব দেখ!"

এই কথা বলিয়া, বিধু সেস্থান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরীর আর আশা নাই, তাহার সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় সে এখন ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার পলায়নের কি আর উপায় নাই? বিশ্বেশ্বরী, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনার মস্তকের চুল স্বহস্তে ছিঁড়িতেছে! আবার এ কিসের শব্দ? বিশ্বেশ্বরী, পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টাও করিতেছে? পদাঘাতে কি সে দরজা ভাঙ্গা যায়? তখন বিশ্বেশ্বরী সেই ক্ষুদ্র জানালা সজোরে ধরিয়া টান দিল। জানালা কি টানিয়া তোলা যায়? তবে বিশ্বেশ্বরী আর কি করিবে? বিলম্ব করিলে এখনি যে পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইবে। সে চিন্তা বিশ্বেশ্বরীর অসহ্য। এখন উপায় কি? অনেক চেষ্টা করিয়া, বিশ্বেশ্বরী বুঝিল যে, এখন আর পলাইবার উপায় নাই! বিশ্বেশ্বরী এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই নীরব ও নিস্তব্ধ রাত্রিকালে, বিশ্বেশ্বরীর সেই বিকট চীৎকার কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু বিশ্বেশ্বরীকে সে অবস্থায় আর অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। এই সময় পুলিসের লোক আসিয়া, দরজা খুলিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বিশ্বেশ্বরীর অবস্থা দেখিয়া, সকলেই তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিল। প্রভাতে যখন গ্রামের মধ্য দিয়া পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিশ্বেশ্বরী যাইতেছিল, তখন গ্রামের ভদ্র অভদ্র আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। এতকাল সকলেই বিশ্বেশ্বরীকে ভয় করিত; কেহ তাহাকে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু আজ আর তাহাকে

কেহ ভয় করিল না। বিশ্বেশ্বরী, বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায়, মনে মনে গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছিল।

পুলিস, মকর্দ্দমার তদারক করিয়া, শ্রীরামপুরের ডেপুটী বাবুর নিকট আসামীকে বিচারার্থে পাঠাইয়া দিল। পশুপতি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, সুতরাং গ্রামের লোকেই মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিল। পশুপতির পুত্র আরোগ্য হইয়াছিল, সুতরাং খুন করিবার চেষ্টা করার অপরাধে. আসামী অভিযুক্ত হইল। ডেপুটী বাবু আসামীকে সেশনে পাঠাইলেন। সেশনের বিচারে বিশ্বেশ্বরীর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। সেশনের বিচার হুগলীতে হয়; সেদিন আদালতগৃহে আর লোক ধরে না। এরূপ পিশাচিনীকে দেখিবার জন্ত অনেক দূর দেশ হইতেও লোক আসিয়াছিল। আমরা কিন্তু আজ আমাদের চিরপরিচিত বিশ্বেশ্বরীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম না। প্রায় দুই মাস কাল হাজতে থাকিয়া তাহার রূপান্তর হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণকন্যা বিশ্বেশ্বরীর হাজতেই মৃত্যু হইল না কেন? ইহারই মধ্যে কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে? বিশ্বেশ্বরীর অবশিষ্ট জীবন নরকসদৃশ কারাগারে না কাটিলে যে, ধর্ম্ম মিথ্যা হইবে! আর তাহার পরজন্মে কি হইবে? আবার কি হইবে?—অনন্ত নরক!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ঔষধ ও তৈলাদি ব্যবহার প্রায় পূর্ব্বমতই চলিতেছে। কবিরাজেরা

বলিয়াছেন যে, এখনও একবৎসরকাল তাঁহাকে ঐরূপ নিয়মে থাকিতে হইবে। চারুশীলার অপঘাত-মৃত্যুর সহিত পশুপতির আরোগ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু সেই দিন চারুশীলার মৃত্যুকালে যখন পশুপতি তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তখন হইতেই পশুপতি যেন প্রকৃতিস্থ হইতে আরম্ভ করিল। পশুপতি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চারুশীলার সেই মৃতদেহ দেখিল, তাহার জীবনের শেষ ঘটনা আগাগোড়া সমস্তই শুনিল, তাহার পর পশুপতি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বাহিরে পুলিশের লোকে যখন বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন পশুপতি তাহাদের সহিত যেরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। থানার সবইনেস্‌-পেক্টার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার ছোট স্ত্রী বিষ খেয়ে মর্‌বার কারণ কিছু আপ্‌নি জানেন?" পশুপতি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে বিশ্বেশ্বরী আমার বড় স্ত্রীকে মার্‌বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দুধ আমার বড় স্ত্রী না খেয়ে আমার ছোট-স্ত্রীর ছেলেটি খায়। ছেলেটি অল্প খেয়েই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। আমার ছোটস্ত্রী ব্যতীত এরূপ অজ্ঞান হওয়ার কারণ কেহই জানিত না। যখন একটা গোলমাল হ'লো—আমার ছোট-স্ত্রী সেখানে এসে শুন্‌লে, আমার বড়-স্ত্রীর দুধের বাটীর দুধ খেয়ে ছেলে অজ্ঞান হয়েছে; তখন সে ছেলের জীবনের কোন আশা নাই ভেবে, নিজে স্বহস্তে অবশিষ্ট দুধটুকু খেয়ে ফেল্‌লে, আর সেই দুধ খেয়েই মৃত্যু হ'লো। পরের মন্দ চেষ্টা কর্‌লে, নিজের মন্দ আগে হয়।"

পশুপতিকে এরূপভাবে কথা কহিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। সময়ে সময়ে পশুপতির পাগলের কোন লক্ষণ থাকিত না বটে, কিন্তু এরূপ একটা ঘটনার পর পশুপতি যে পুলিশের লোকের সম্মুখে এরূপভাবে কথা কহিতে পারে, একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। এই সময় সেই সব্‌ইনেস্‌পেক্টার বলিল,—"আমি এ লাস চালান দিতে ইচ্ছা করি। সরকারী ডাক্তার এ লাস পরীক্ষা না করলে, আপনারা সৎকার করতে পাবেন না।"

পশুপতি বলিল,—"আমার তাতে কোন আপত্তি নাই। আপনি এ লাস নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

কিন্তু গ্রামের লোকে পড়িয়া সে লাস চালান দিতে দিল না। অবশ্য তাহার জন্য পুলিশকে কিছু পূজা দিতে হইয়াছিল। লাস জ্বালাইবার হুকুম হইলে অন্যান্য লোকের সহিত পশুপতিও শ্মশানে গিয়াছিল। সেখানেও তাহার কোন পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। পশুপতি নিজে চারুশীলার মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

সৎকার শেষ হইয়া গেলে, সকলের সহিত পশুপতির গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন একজন প্রতিবাসী পশুপতিকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন,—"অদৃষ্টে যার যা লেখা আছে, কেউ তার খণ্ডন করতে পারে না। তুমি কেন বৃথা ভেবে আমার শরীর নষ্ট করবে বাবা?"

পশুপতি ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি সে বিষয় ভাবছি না। ভাবছি, আমার নিজের বিষয়। আমি কি গুণে এতদিন মুগ্ধ হয়েছিলুম, আমি আজ তাই ভাবছি। কি করে

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে এতদিন অলক্ষ্মীর পূজা করেছিলাম, আমি তাই ভাব্‌ছি।”

পশুপতি যখন নিজের বিষয় ভাবিতে শিখিয়াছে, তখন যে পশুপতি আরোগ্যলাভ করিয়াছে, একথা তখন সকলের মনেই ধারণা হইয়া গেল। আমরা সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, চারুশীলার অপঘাত মৃত্যুর সহিত পশুপতির আরোগ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি? সে যাহা হউক, পর দিন রাত্রে তারাসুন্দরীর সহিত পশুপতির কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বলি শুন।

পশুপতি প্রথমেই আরম্ভ করিল,—“তারা, আমি এতদিন পিশাচিনীর মায়ায় মুগ্ধ হ’য়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম। এখন সে পিশাচিনী নাই, তার মায়াও নাই, তাই আবার জ্ঞানের উদয় হয়েছে।”

তারাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—“সে ত সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী, তাকে পিচাশিনী বলো না। তোমার মতন স্বামী আর একমাত্র পুত্র সন্তান রেখে যে মর্‌তে পারে, তার মতন ভাগ্যবতী আর কে আছে?”

পশুপতি।—তার ব্যবহারে তাকে পিশাচিনী বলি। তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছে, একবার ভেবে দেখ দেখি।

তারাসুন্দরী।—সে এখন স্বর্গে চলে গেছে, আমার কথা কিছু শুন্‌তে আস্‌বে না; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে, আমি তার কোন দোষ দেখি না। সে ছেলে মানুষ; যেরূপ শিক্ষা পেয়েছে, সেইরূপই করেছে। এতে তার দোষ কি?

পশুপতি।—এতে যদি তার কোন দোষ না থাকে, তবে সমস্ত দোষ আমার।

তারাসুন্দরী এইবার যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"কি! তোমার দোষ! এ কথা যে বল্‌বে, তার নরকেও স্থান হবে না। তোমার মতন স্বামীর কোন দোষ থাক্‌তেই পারে না।" ধন্য তারাসুন্দরি!

পশুপতি স্থিরদৃষ্টিতে তারার মুখের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল। হঠাৎ পশুপতির মুখ হইতে নির্গত হইল,—"তবে কার দোষ, তারা?"

তারাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে, তোমার মতন স্বামী পেয়েও স্বামীসুখে বঞ্চিত হবো কেন?"

পশুপতি এক সুদীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তুমি আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে আমায় বুঝুতে চেষ্টা কর্‌ছো, কিন্তু আমি কি করে বুঝ্‌বো? তোমার ওরূপ কথায় আমার মনকে তো প্রবোধ দিতে পার্‌ছি না। এখন আমার সব কথাই মনে হচ্ছে; সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার পাপের এখনও কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই!"

তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তোমার আবার পাপ কি?"

"তবে তুমি যদি ক্ষমা কর তারা—তবে তুমি যদি ক্ষমা কর তারা"—বলিতে বলিতে পশুপতি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরী আপনার বস্ত্রাঞ্চলে পশুপতির দুই চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল,— "তোমার প্রতি আমার বিশ্বাসের যদি কোনরূপ ত্রুটি হ'য়ে থাকে, তবে, জন্মান্তরে যেন আমি তোমায় বঞ্চিত হই—এর চেয়ে কঠিন দিব্যি আমি আর জানি না।

বলিতে বলিতে তারাসুন্দরীরও গণ্ডস্থল বহিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল; তৎক্ষণাৎ পশুপতি স্বহস্তে সে অশ্রুজল মুছাইয়া দিল। তারাসুন্দরী পুনরায় আরম্ভ করিল,—"তোমার দোষ কি? আমিই ত তোমায় পুনরায় বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলুম। আমার কি সে কথা মনে নাই। আমি তখন তোমায় বলেছিলুম যে, তোমার শতসহস্র দাসীর মধ্যে একজন হলেই আমি ধন্য হবো। তোমার পাপ কি? আমিই পাপী, তা নইলে তোমায় সে সময় সুখী দেখে আমার মনে কষ্ট হবে কেন?"

পশুপতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তোমায় ভুলে আমি কি সুখী হয়েছিলুম, তারা? আমি একদিনের জন্যও সুখী হতে পারি নি। আমার যেন সে সকল কথা এখন স্বপ্ন বলে ভ্রম হচ্ছে। আমার কি সুখেরই সংসার ছিল! তুমি যে সংসারের গৃহলক্ষ্মী, সে সংসারের আবার কষ্ট কি? মা কেবল ছেলে ছেলে ক'রেই এই সর্ব্বনাশ কল্লেন্। এখন ছেলে হয়েই আমি চতুর্ভুজ হয়েছি?"

তারাসুন্দরী।—মার দোষ কি? সকল মায়েই এরূপ করে থাকেন। আর শুনেছি, আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিবাহ করা ত কেবল ছেলেরই জন্যে।

পশুপতি।—আর সেই সর্ব্বনাশী বিষী পিসিই আমার সোণার সংসার ছারখার করেছে। তার প্রতিফল এইবার সে পাবে।

তারাসুন্দরী। আমি কাহাকে কোন দোষ দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি কি প্রারব্ধ মান না? প্রারব্ধের ভোগ থাকিলে,

কে খণ্ডাতে পারে? বিষীপিসির দোষ কি? সে এখন বড় বিপদগ্রস্ত; ঈশ্বর তার ভাল করুন।

পশুপতি এবার যেন উন্মত্তভাবে বলিল,—"তারা—তারা! তোমার এত গুণ! শত্রুর প্রতিও তোমার এত দয়া! আমি অতি নরাধম, তা নইলে কুহকিনীর মায়ায় ভুলে তোমার মতন সতীলক্ষ্মীকেও অনাদর করেছিলুম! আশীর্ব্বাদ করি—"

পশুপতি সে বেগবান্ হৃদয়ের বেগ আর রাখিতে পারিল না। তখন আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে তারাসুন্দরীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিল। আর তারাসুন্দরী? তারাসুন্দরী তখন স্বামীর আদরে গলিয়া গিয়া, স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিল,—"তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আদরে আমি যেমন সুখী হই, তোমার অনাদরেও যেন তেম্নি সুখী হতে পারি। আমি ঠেকে শিখেছি, এর্ চেয়ে মূল্যবান্ আশীর্ব্বাদ আমার পক্ষে আর কিছুই নাই।"

পশুপতি মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিল, আমরা জানি না; কিন্তু প্রকাশ্যে পুনরায় মুখচুম্বন করিতে আমরা দেখিয়াছিলাম।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পশুপতির পুত্রের নাম সুবোধচন্দ্র। সুবোধের বয়ঃক্রম এখন পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুবোধ যথার্থই সুবোধ। এমন ধীর ও শান্ত ছেলে কেহ কখন দেখে নাই। সুবোধ জনকজননী ও পিতামহীর জীবনস্বরূপ ছিল; বিশেষতঃ তারাসুন্দরী যদি মুহূর্ত্তের জন্য সুবোধকে দেখিতে না পাইত

তবে তৎক্ষণাৎ চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিত ; আর সুবোধও 'মা' বলিতে অজ্ঞান হইত। পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে ; কিন্তু বিমাতা 'সতীনপোকে' এরূপ স্নেহ করিতে কেহ কখন দেখে নাই!

পশুপতির সংসারে এখন সুখের সীমা নাই। তারাসুন্দরীর পিতৃসম্পত্তি এখন সমস্তই পশুপতির হইয়াছে। পশুপতি তাহার আয় হইতে আরও নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং অর্থ-সম্বন্ধে পশুপতি এখন একজন বড়লোক হইয়াছে বলিলেও বলা যায়। আর তারাসুন্দরীর ন্যায় স্ত্রী যে গৃহে, সে গৃহে ত লক্ষ্মী বাঁধা থাকিবারই কথা। পশুপতি-জননীর স্বভাবেরও এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি এখন আর সেরূপ কোন্দল-প্রিয়, ক্রোধপরবশ বা অভিমানিনী নন। এখন তিনি সংসারের উপর যেরূপ কর্ত্তৃত্ব করেন, নিজের প্রবল রিপু সকলেরও উপর সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। আর পশুপতির সংসারের সকল সুখের মূলাধার আমাদের সুবোধচন্দ্র। যেখানে যে বিষয়ে যে কিছু ত্রুটি হউক না কেন, এই পঞ্চম বৎসরের শিশু সুবোধ-চন্দ্র সে ত্রুটি পূরণ করিত। ধন্য শিশুর ক্ষমতা!

একদিন পশুপতি তারাসুন্দরীকে বলিলেন,—"তারা, এখন তোমার চাকর, চাকরাণী, রাঁধুনী কিছুরই অভাব নাই ; তবে নিজে এত পরিশ্রম ক'রে শরীর মাটী কর কেন?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"পরিশ্রম করলে কি শরীর মাটী হয়, না শরীর আরও ভাল থাকে।"

পশুপতি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমার মতন

অত বেশী পরিশ্রম কর্‌লে শরীর কখনই ভাল থাকে না। আর তোমার অত পরিশ্রমের দরকার কি ?”

তারাসুন্দরী পুনরায় হাসিয়া বলিল,—“ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, ব্রাহ্মণভোজনই হউক, আর কাঙ্গালিভোজনই হউক, নিজে না দেখ্‌লে কি কোন কাজে মনের তৃপ্তি হয় ?”

পশুপতি।—কোন ক্রিয়াকলাপের কথা বল্‌ছি না, এখন প্রতিদিনই ত তোমায় গুরুতর পরিশ্রম কর্‌তে দেখি।

তারাসুন্দরী।—তোমায় অন্ন ব্যঞ্জন অন্যে রেঁধে দিলে, আমার মনের তৃপ্তি হয় না, তাই আমি রোজ রাঁধি। আর তোমায় খাইয়ে যে সুখ হয়, তার চেয়েও বেশী সুখ হয়, আমার সুবোধকে খাইয়ে। আমি সুবোধকে খাওয়ানর ভার কারো উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। এ কাজে মাকেও আমার বিশ্বাস হয় না।

এই সময় হঠাৎ একটা কি কথা পশুপতির মনে উদয় হইল, পশুপতি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“আচ্ছা তারা, তুমি আমায় বেশী ভালবাস, না সুবোধকে বেশী ভালবাস ?”

তারাসুন্দরী হঠাৎ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—“আমি দু'জনকেই সমান ভালবাসি।”

পশুপতি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“তবু তার কমবেশী কিছু নাই কি ?”

তারাসুন্দরী পুনরায় বড় গোলে পড়িল। এক বিষয় ভাবিতে গেলে, পশুপতি ভারি হয় ; আবার অন্য বিষয় ভাবিতে গেলে

সুবোধ ভারি হয়; সুতরাং তারাসুন্দরী কি উত্তর দিবে? কিন্তু পশুপতি কোন ক্রমেই ছাড়েন না, তাঁহার কৌতূহল বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। তখন তারাসুন্দরীকে বাধ্য হইয়া উত্তর করিতে হইল,—"তোমা হ'তেই ত সুবোধকে পেয়েছি, সুতরাং তুমি মূল, সুবোধ সেই মূলের শাখা। তবে তোমার খাওয়ান-দাওয়ান আমি যদি একদিন না দেখ্‌তে পাই, তাতে আমার তত কষ্ট হয় না, কিন্তু সুবোধকে যদি একবেলা আমি নিজের হাতে না খাইয়ে দিই, তবে আমার মনে হয়, বাছার আমার আজ বুঝি খাওয়া হয় নাই। তুমি অনেক সময় নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ বাহিরে থাক, সময় সময় দেখ্‌বার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয় সত্য; কিন্তু সুবোধ যদি বাহিরে খেল্‌তে গিয়ে বাড়ী আস্‌তে একটু বিলম্ব করে, আমার প্রাণ একবারে কেঁদে উঠে, আমি যেন তখন চারিদিক অন্ধকার দেখি।"

তারাসুন্দরীর উত্তরে পশুপতির আনন্দের সীমা নাই। এ সংসারে মানুষ সকলের হিংসা করে, কিন্তু পুত্রের হিংসা কেহ করে না। আমা অপেক্ষা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও যশস্বী হউক, এ কামনা এক পুত্র ভিন্ন লোকে আর কাহারও জন্য করে না। পশুপতি আনন্দে অধীর হইয়া তখন তারাসুন্দরীর মুখচুম্বন করিলেন, তারাসুন্দরীর আনন্দ সাগরও তাহাতে উথলিয়া উঠিল। কিন্তু উভয়ের সে আনন্দের বেগ থামিতে না থামিতেই সুবোধ-চন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তারাসুন্দরী দৌড়িয়া গিয়া সুবোধকে কোলে লইয়া স্বামীর চুম্বনের প্রতিশোধ পুত্রের উপর লইল। কিন্তু একি! আজ সুবোধের মুখখানি এত বিষণ্ণ কেন? জননীর কোলে উঠিলে যে সুবোধ হাসির লহরী তুলিয়া

অতিবড় শত্রুকেও মোহিত করিয়া ফেলিত, আজ তাহার সেই হাসির লহরী কোথায় গেল? আবার একি! চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিতেছে যে! দেখিতে দেখিতে সুবোধের গণ্ডস্থল হইতে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। তখন তারাসুন্দরী কি আর স্থির থাকিতে পারে? পুত্র কোলে করিয়া তারাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল।

তারাসুন্দরীর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে, তাহার মুখে আর কথা নাই! পশুপতি তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"কি হয়েছে বাবা?"

সুবোধ, পিতার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না; কিন্তু এবার জননীর গলা সজোরে জড়াইয়া কাঁদিল। পশুপতি বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। স্বহস্তে সে অশ্রুজল মুছাইয়া বলিলেন,—"কি হয়েছে বল না বাবা? কেউ কি তোমায় মেরেছে, না গাল্ দিয়েছে?"

এইবার অনেক কষ্টে তারাসুন্দরীর মুখ হইতে কথা বাহির হইল,—"ওগো আমার সুবোধ তেমন ছেলে নয়; আমি নিশ্চয় বল্ছি, সুবোধকে কেউ মারে-নি বা গাল দেয়-নি। আমার প্রাণ বড় কেঁদে উঠ্ছে, বাছার আমার কোন অসুখ করে-নি ত?"

পিতার মনে এরূপ কোন আশঙ্কার উদয় হয় নাই, কিন্তু মায়ের প্রাণ পুত্রের পীড়ার জন্য সদাই সশঙ্কিত। তারাসুন্দরীর আশঙ্কার কথা শুনিয়া, পশুপতির প্রাণও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পশুপতি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"তোমার কি কোন অসুখ করেছে বাবা?"

পিতামাতার বাহ্য আকারে তাঁহাদিগের মনের অবস্থা তখন সেই ক্ষুদ্র বালকেরও বুঝিতে বাকি রহিল না। বালক তৎক্ষণাৎ

ক্রন্দন করিয়া বলিল,—"না মা, তুই কাঁদিস্‌নে, আমার কোন অসুখ করে-নি।"

পুত্রের কথায় তখন জনকজননী কতকটা সুস্থির হইলেন। তারাসুন্দরী পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"তবে তোমায় কেউ কি কিছু মন্দ কথা বলেছে বাবা?"

জননীর কথায় বালকের চক্ষু পুনরায় ছল্‌-ছল্‌ করিতে লাগিল। পশুপতি আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"কে তোমায় কি বলেছে বাবা?"

সুবোধ তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে আরম্ভ করিল,—"গোপাল আর ধীরেনের সঙ্গে খেল্‌ছিলাম বাবা, তা খেল্‌তে খেল্‌তে আমার মার জন্যে বড় মন-কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। তাই খেলা ফেলে চলে আস্‌ছিলুম, তারা আমায় আস্‌তে দেবে না। আমি যখন বল্লুম, আমার মার জন্যে বড় মন-কেমন কর্‌ছে,তখন তারা আমায় বল্লে কি না বাবা, তোর মাতো মরে গেছে রে—তুই যাকে মা বলিস্‌, সে ত তোর মা নয়, সে তোর 'বিমাতা।' হাঁ মা, তুই আমার মা নস্‌, তুই কি আমার বিমাতা?"

কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, অশ্রুজলপূর্ণ সতৃষ্ণনয়নে বালক জননীর মুখপানে চাহিল। তারাসুন্দরীর মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। পশুপতি তৎক্ষণাৎ বালকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"গোপাল আর ধীরেন মিছে কথা বলেছে বাবা। যে মরে গেছে, সে তোমার মা নয়, সেই তোমার বিমাতা, আর এই তোমার মা।"

বালকের মুখ যেন প্রফুল্ল হইল, বালক প্রফুল্ল মুখে বলিল,—"বিমাতা কাকে বলে বাবা?"

পশুপতি উত্তর করিলেন,—"মায়ের শক্রকে বিমাতা বলে বাবা।"

বালকের আনন্দের সীমা নাই। বালক এইবার আনন্দের লহরী তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তবে আমি গোপাল আর ধীরেনকে এ কথা বলে আসিগে মা?"

কিন্তু মা আর বালককে ছাড়িয়া দিল না, সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গিয়া বালকের মুখচুম্বন করিল।

সম্পূর্ণ।